যিলহজ, ঈদ ও কোরবানি

(বাংলা)

عشر ذي الحجة وعيد الأضحى وأحكام الأضحية

« باللغة البنغالية »

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

عبد الله شهيد عبد الرحمن

2011 - 1432

IslamHouse.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

যিলহজ মাসের প্রথম দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ দশকে এবাদত-বন্দেগির তুলনায় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় অন্য কোনো কাল ও সময় নেই মর্মে হাদিসে এসেছে।

আরাফা দিবস মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ দিবস, যে দিবসের রোজা বিগত ও আগত এক বছরের পাপের কাফ্‌ফারা—এ দিবসটিও যিলহজ মাসের প্রথম দশকেই অবস্থিত। ইয়াউমুন নাহর—যা হাদিস অনুযায়ী সমধিক মহিমান্বিত দিবস বলে খ্যাত—যিলহজ মাসের প্রথম দশকেই অবস্থিত।

বড় ঈদ ও কোরবানি এ দশকেই স্থান পেয়েছে। সে হিসেবে যিলহজ মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব অন্যান্য দিবসকে ছাপিয়ে—শবে কদর বাদে—সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তবে দু:খের ব্যাপার হল, যিলহজ মাসের প্রথম দশক আদৌ কোনো গুরুত্বের ব্যাপার নয় ;—অন্তত আমাদের দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। সর্বোত্তম দিবসগুলোর ব্যাপারে এই উদাসীনতার আড়ালের কারণ কী তা আমাদের জানা নেই। তবে আশা করা যায়, আমাদের বর্তমান প্রকাশনাটি এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকশ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

প্রাজ্ঞ গবেষক ও অনুবাদক আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান আরবি থেকে বইটি অনুবাদ করে একটি শূন্যতা পূরণ করেছেন—সন্দেহ নেই। এ জন্য তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদ পাবার উপযোগী। নুমান বিন আবুল বাশার, কাউসার বিন খালেদ অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটির পরিচালকবৃন্দ বইটির সার্বিক সৌন্দর্য-বর্ধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বইটি প্রকাশ করতে পেরে সত্যি আমরা আনন্দিত ও আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের শ্রম কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক
মহাপরিচালক:আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি
পরিচালক: বাংলা বিভাগ- islamhouse.com

অনুবাদকের কথা

জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা। তার রহমত ও আমাদের হৃদয়-নিংড়ানো সালাম সাইয়েদুল মুরসালিন ও তার সহচরগণের প্রতি সর্বদা নিবেদিত হোক।

আমাদের দেশের কোন ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলিমকে আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন 'যিলহজ মাসের দশ তারিখে কোরবানি ঈদ। এর পূর্বের দিনগুলোর তাৎপর্য-ফজিলত, করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?' সে উত্তরে বলবে—'যারা কোরবানি করবে তারা এ দিনগুলোতে গরু-ছাগলের হাটে যাবে, কোরবানির জন্য পশু ক্রয় করবে।' ব্যস ! এ ছাড়া আর কি করার আছে ?

হ্যাঁ যিলহজ মাসের প্রথম দশক ও এর করণীয় সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর।

আর এ গাফিলতির নিদ্রা অবসানের লক্ষ্যে প্রখ্যাত গবেষক ফায়সাল বিন আলী বাদানি ও আবু আনাস খায়রুল্লাহর তত্ত্বাবধানে আরবী ভাষায় খুবই কার্যকরী একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ বাজারে আসে, বর্তমান সমাজ ও সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় যা খুবই প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি।

সাত বছর পূর্বে যখন কিতাবটি হাতে আসে তখন এর অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করি। আমাদের দেশে এ বিষয়ে লেখা কোন বই নেই—যতদূর আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি—তেমনি এ বিষয়ে তেমন আলোচনাও চোখে পড়ে না। যখন হাটহাজারীর দারুল উলুমে দাওরায়ে হাদিস শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলাম, তখন দেখেছি আমাদের মুহসিন আসাতেজায়ে কেরাম যিলহজ মাস আসার পূর্বেই আশে-পাশের মহল্লার লোকজনকে ডেকে আলোচনা সভা করে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতেন। মনে করেছিলাম তাঁদের এ সুন্দর উদ্যোগ দেশের সর্বত্র প্রসারিত হবে, মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হবে। কিন্তু তা আশানুরূপ হয়নি।

এ কিতাবে শুধু যিলহজ মাসের ফজিলত, কোরবানি ও ঈদ সম্পর্কে আলোচনা হয়নি। এ সকল বিষয়ের সাথে সাথে আরো অনেক

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন তওবা কবুলের শর্তাবলি, গাইরুল্লাহর নামে পশু জবেহ করার পরিণাম, গান-বাদ্যের হুকুম—ইত্যাদি বহু বিষয়, যা মুসলিম সমাজে প্রসার করা অতীব প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

আল্লাহর ফজলে বর্তমানে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে মূলের দিকে ফিরে যাওয়ার একটা চেতনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর প্রভাবে মুসলমানগণ সবকিছু কোরআন ও হাদিসের আশ্রয়ে জানতে ও বুঝতে চায়। এ এক বিরাট অগ্রগতি ও জাগরণের লক্ষণ—সন্দেহ নেই। সামাজিকভাবে এ পরিস্থিতির উদ্ভবের পূর্বের প্রেক্ষাপটে আমরা লক্ষ্য করি যে, মানুষের ইসলাম সম্পর্কে যখন কোন কিছু বুঝার দরকার হত তখন কোন আলেমের শরণাপন্ন হত। তিনি যা বলতেন তা মেনে নিত। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা নেই। কোন কিছু বললে জানতে চাওয়া হয় এটা কোথায় আছে ? এর দলিল-প্রমাণ কি ?—ইত্যাদি। এ চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে সংকলকবৃন্দ সকল মাসআলার কোরআন-হাদিস ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তাই এ বই-এর মাধ্যমে আলেম-উলামা, দাওয়াত-কর্মী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কেউ উপকৃত হবেন বেশি। তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। এমনিভাবে এর থেকে ইস্তেফাদা অব্যাহত থাকবে এবং এ প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব লাভ করবেন আল্লাহর মেহেরবানিতে। এটাই আমাদের সকলের জন্য বিরাট অর্জন।

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
২৯-১০-১৪২৮ হিজরি

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের

ফজিলত ও আমল

যিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত

ইসলামে যতগুলো মর্যাদাবান ও ফজিলতপূর্ণ দিবস রয়েছে তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন। এর মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অনেক বাণী রয়েছে। এ সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এ দিবসগুলোর রাত্রি সমূহের শপথ করেছেন। আমরা জানি আল্লাহ তাআলা যখন কোন বিষয়ের শপথ করেন তখন তা তার গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। তিনি এরশাদ করেন—

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

'শপথ ফজরের ও দশ রাতের'।[1]

সাহাবি ইবনে আব্বাস রা., ইবনে যুবাইর ও মুজাহিদ রহ. সহ আরো অনেক মুফাসসিরে কেরাম বলেছেন যে, দশ রাত বলতে এ আয়াতে যিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতের কথা বলা হয়েছে। ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন'এ মতটিই বিশুদ্ধ।'[২]

নবী কারীম স. থেকে এ দশ রাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বাণী পাওয়া যায় না।

(২) রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : যিলহজের প্রথম দশ দিন হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিন। এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস এসেছে। যার কয়েকটি তুলে ধরা হল—

১.

عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال : **ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر**، فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في

---

[1] সূরা ফজর : ১-২

[2] তাফসীরে ইবনে কাসীর

سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : **ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.** (رواه البخاري ٩٦٩ والترمذي ٧٥٧ واللفظ له)

সাহাবি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত প্রিয় আল্লাহর নিকট আর কোন আমল নেই।** তারা প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি তার চেয়ে প্রিয় নয় ?

রাসূলুল্লাহ স. বললেন : **না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে গেল অত:পর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এল না।**[1]

২.

عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- عن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال : **ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.** (رواه أحمد ١٣٢ وقال أحمد شاكر :إسناده صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত নবী কারীম স. বলেছেন : **এ দশ দিনে (নেক) আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে পাঠ কর।**[2]

৩.

ما من أيام أفضل من أيام عشر ذي الحجة، قال : فقال رجل : يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهاداً في سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله...(صحيح ابن حبان ٣٨٥٣ و ذكر محققه أنه حديث صحيح انظر ٩١٦٤)

যিলহজের প্রথম দশ দিনের চাইতে উত্তম কোন দিন নেই। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! এ দশ দিন (আমলে সালেহ) উত্তম, না

১-বোখারি -৯৬৯, তিরমিজি- ৭৫৭

[2] -আহমদ-১৩২, হাদিসটি সহিহ

আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি উত্তম ? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি চেয়ে তা (আমল) উত্তম।[১]

এ তিন হাদিসের অর্থ হল—বছরে যতগুলো পবিত্র দিন আছে তার মাঝে এ দশ দিনের প্রতিটি দিন হল সর্বোত্তম। যেমন এ দশ দিনের অন্তর্গত কোন জুমআর দিন অন্য সময়ের জুমআর দিন থেকে উত্তম বলে বিবেচিত।

(৩) আল্লাহর রাসূল স. এ দিনসমূহে নেক আমল করার জন্য তার উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তার এ উৎসাহ এ সময়ের ফজিলত প্রমাণ করে।

(৪) নবী কারীম স. এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আলোচিত হয়েছে উপরে ইবনে আব্বাসের হাদিসে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ . (الحج : ٢٨)

'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিন সমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।'[2]

এ আয়াতে নির্দিষ্ট 'দিনসমূহ' বলতে কোন দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে ইমাম বোখারি রহ. বলেন—

قال ابن عباس: أيام العشر

'ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ দ্বারা যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।'[3]

(৫) যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফা ও কোরবানির দিন। আর এ দুটো দিনের রয়েছে অনেক বড় মর্যাদা। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عائشة– رضى الله عنها– قالت : إن رسول الله– صلى الله عليه وسلم– قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول : ما أراد هؤلاء؟ .(رواه مسلم ١٣٤٨)

---

[1] ইবনে হাব্বান : ৩৮৫৩

[2]- সূরা হজ্ব ঃ ২৮

[3] সহিহ আল-বোখারি, ঈদ অধ্যায়

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেন : 'আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন—'তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায় ?'[1]

আরাফাহ (যিলহজ মাসের নবম তারিখ)-এ-দিনটি ক্ষমা ও মুক্তির দিন। এ দিনে সওম পালন করলে তা দু বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে গণ্য হয়। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أبي قتادة– رضى الله عنه– أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم– قال :...صيام يوم

عرفة احتسب على الله أن يكفرا السنة التي قبله والسنة التي بعده ...(رواه مسلم ١٦٦٢)

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেন : **'আরাফার দিনের সওম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করেন।'**[2]

তবে আরাফার এ দিনে আরফাতের ময়দানে অবস্থানকারী হাজীগণ সওম পালন করবেন না। কোরবানির দিনের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে :—

عن عبد الله بن قرط– رضى الله عنه– قال: قال رسول الله– صلى الله عليه وسلم– : أعظم الأيام

عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر. (رواه أبو داود ١٧٦٥ وصححه الألباني ١٥٥٢)

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **'আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে উত্তম দিন হল কোরবানির দিন তারপর কোরবানি পরবর্তী মিনায় অবস্থানের দিনগুলো।'**[3]

(৬) যিলহজ মাসের প্রথম দশকের এ দিনগুলো এমন মর্যাদাসম্পন্ন যে, এ দিনগুলোতে সালাত, সওম, সদকা, হজ ও কোরবানি আদায় করা হয়ে থাকে। অন্য কোন দিন এমন পাওয়া যায় না যাতে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল একত্র হয়।

একটি জিজ্ঞাসা : রমজানের শেষ দশক অধিক ফজিলতপূর্ণ না কি যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন বেশি ফজিলতসম্পন্ন ?

---

[1] মুসলিম-১৩৪৮

[2] মুসলিম-১৬৬২

[3] আবু দাউদ-১৭৬৫, হাদিসটি সহিহ

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিবস অধিক ফজিলতপূর্ণ—এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। করণ, এ বিষয়ে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তবে মতভেদের অবকাশ রয়েছে রাত্রির ফজিলত নিয়ে। অর্থাৎ, রমজানের শেষ দশকের রাত বেশি ফজিলতপূর্ণ না যিলহজের প্রথম দশকের রাতসমূহ বেশি ফজিলতের অধিকারী ?

বিশুদ্ধতম মত হল, রাত হিসেবে রমজানের শেষ দশকের রাতগুলো ফজিলতের দিক দিয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আর দিবসের ক্ষেত্রে যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিবস অধিক মর্যাদার অধিকারী।

ইবনে রজব রহ. বলেন : যখন রাত্র উল্লেখ করা হয় তখন দিবসগুলোও তার মাঝে গণ্য করা হয়। এমনিভাবে, যখন দিবস উল্লেখ করা হয় তখন তার রাত্রিগুলো তার মাঝে গণ্য হয়—এটাই নিয়ম। এ ক্ষেত্রে শেষ যুগের উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। তাহল, সামগ্রিক বিচারে যিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিবসগুলো রমজানের শেষ দশকের দিবস সমূহের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। আর রমজানের শেষ দশকের লাইলাতুল কদর হল সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. এ ক্ষেত্রে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন : রমজানের শেষ দশকের রাতগুলো সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ। কারণ, তাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে। অপরদিকে, যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের দিবসসমূহ অধিকতর ফজিলতপূর্ণ, কারণ এ দিনগুলোতে তালবীয়াহ-এর দিন, আরাফার দিন, কোরবানির দিন রয়েছে।[1]

যিলহজ মাসের প্রথম দশকে নেক আমলের ফজিলত

عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال : **ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر،** فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : **ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.** (رواه البخاري ٩٦٩ والترمذي ٧٥٧ واللفظ له)

সাহাবি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত প্রিয় আল্লাহর নিকট আর কোন আমল নেই**। তারা (সাহাবিগণ) প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি তার চেয়ে প্রিয় নয় ?

---

[1] যাদুল মাআদ: ইবনুল কায়্যিম

রাসূলুল্লাহ স. বললেন **: না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে গেল অত:পর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এল না**।[1]

ইবনে রজব রহ. বলেছেন : বোখারির এই হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, নেক আমল করার মৌসুম হিসেবে যিলহজ মাসের প্রথম দশক হল সকল দিবসসমূহের চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অধিক প্রিয়। যা আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় তা তাঁর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। হাদিসের কোন কোন বর্ণনায় আহাব্বু (প্রিয়) শব্দটি এসেছে আবার কোন কোন বর্ণনায় আফজালু (মর্যাদাসম্পন্ন) কথাটা এসেছে।

অতএব এ সময়ে নেক আমল করা বছরের অন্য যে কোন সময়ে নেক আমল করার চেয়ে বেশি মর্যাদা ও ফজিলতের অধিকারী হবে। তাই তো এ সময়ে হজ, কোরবানির মত গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ সম্পন্ন করা হয়।

যিলহজের প্রথম দশ দিনে যে সকল নেক আমল করা যেতে পারে

খাঁটি মনে তওবা করা—

তওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন বা ফিরে যাওয়া। যে সকল কথা ও কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অপছন্দ করেন তা থেকে যে সকল কথা ও কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার নাম তওবা—হোক এ সকল কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে। সাথে সাথে অতীতের এ ধরনের কাজ থেকে অনুতপ্ত হতে হবে, কাজগুলো ত্যাগ করতে হবে ও দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে ঐ ধরনের কাজ আর কোন দিন করব না। আরো সংকল্প করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় কাজ যেমন আদায় করব তেমনি তার নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করব।

যখনই কোন পাপ কাজ সংঘটিত হবে তখন সাথে সাথে তা থেকে তওবা করা একজন মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। কেননা, তার জানা নেই কখন তার মৃত্যু হবে আর কতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে। মনে রাখতে হবে, একটি পাপ বা গুনাহ অন্য আরেকটি গুনাহের দ্বার খুলে দেয়। তওবা না করলে এমনিভাবে গুনাহের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর সময়ের মর্যাদা হিসেবে গুনাহের শাস্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বা ফজিলতপূর্ণ সময়ে গুনাহের কাজের শাস্তি বেশি হয়। প্রথমত গুনাহের শাস্তি দ্বিতীয়ত ফজিলতপূর্ণ সময়ের অবমাননা ও অবমূল্যায়ন করার শাস্তি।

১-বোখারি -৯৬৯, তিরমিজি- ৭৫৭

ইমাম নববী রহ. বলেন : ‘মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল সকল ধরনের গুনাহ্ থেকে তওবা করা যা সে করেছে। যদি কোন এক ধরনের গুনাহ্ থেকে তওবা করে তাহলেও তার তওবা সঠিক হবে। তবে অন্য গুনাহের তওবা তার দায়িত্বে থেকে যাবে। কোরআনের বহু আয়াত, একাধিক হাদিস ও ইজমায়ে উম্মাহ তওবা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[1] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেন :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (التحريم : ٨)

‘হে মোমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর—বিশুদ্ধ তওবা ; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তার মোমিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’[2]

ইবনে কায়্যিম রহ. বলেন : খাঁটি তওবা (তওবা নাছুহ) হল তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম। প্রথম : সকল প্রকার গুনাহ থেকে তওবা করা। এমন যেন না হয় কয়েকটি গুনাহ থেকে তওবা করলাম, দু একটি রেখে দিলাম এ ভেবে যে এ থেকে আরো কয়েক দিন পরে তওবা করব। এমন করলেও তওবা হবে, তবে তা তওবা নাছূহ হিসেবে গৃহীত হবে না—যে তওবা করতে আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় : সম্পূর্ণভাবে পাপ পরিত্যাগ করার জন্য সততার সাথে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। এমন যেন না হয় যে তওবা করলাম আর মনে মনে বললাম জানি না, আমি এ তওবার উপর অটল থাকতে পারব কি-না।

তৃতীয় : তওবা খালেছভাবে আল্লাহকে ভয় করে ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষেই করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

---

[1] নুজহাতুল মুত্তাকীন শরহু রিয়াজুসসালিহীন

[2] সূরা তাহরীম : ৮

অবশ্যই এ তওবার সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে অব্যাহতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও সকল গুনাহ বা পাপ নিজের থেকে মিটিয়ে দিতে হবে। তা হলেই কামেল তওবা বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।[1]

তওবা কবুলের শর্ত

সাধারণভাবে তওবা কবুলের জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে।

(১) তওবা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন নিয়তে করলে তওবা হবে না। মানুষকে দেখানোর জন্য বা শোনানোর জন্য বা অন্য কোন স্বার্থ হাসিলের স্বার্থে তওবা করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

فَاعْبُدِ اللهَّ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر : ٢)

সুতরাং আল্লাহর এবাদত কর, তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।[2]

তওবা করা যেহেতু একটি এবাদত তাই তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যেই করতে হবে।

(২) যে পাপ বা গুনাহ করা হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, আফসোস করতে হবে। কেননা হাদিসে এসেছে :—

الندم توبة (صحيح الجامع رقم ٦٨٢٠)

'অনুতপ্ত হওয়ার নামই তওবা।'[3]

তাই যে গুনাহ হয়ে গেছে তার জন্য আন্তরিকভাবে দু:খিত হতে হবে।

(৩) গুনাহ বা পাপকে পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা। যদি পাপ থেকে তওবা করে আবার সে পাপ কাজে লিপ্ত থাকা হয় তবে তা আল্লাহ তাআলার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার শামিল।

যদি পাপ কাজটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অধিকার (হুকুকুল্লাহ) খর্ব করা সংশ্লিষ্ট হয় তবে সেটা ছেড়ে দিতে হবে। আর যদি পাপ কাজটি মানুষের অধিকার (হকুকুল এবাদ) ক্ষুণ্নকারী হয় তবে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কোন মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় তবে তা তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কারো সম্মানের হানি করা হয়—যেমন গিবত বা দোষ-চর্চা করা হল বা গালি দেয়া

---

[1] মাদারেজ আস-সালেকীন

[2] সূরা যুমার :২

[3] সহিহ আল-জামে, হাদিস নং- ৬৮২০

হল অথবা মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বা অন্য কোনভাবে মিটমাট করে দাবি ছাড়িয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করা এমন পাপ যা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইলেও তিনি ক্ষমা করবেন না।

(৪) 'ভবিষ্যতে কখনো এ পাপে লিপ্ত হব না'—এমন দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। যদি আবার উক্ত পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে আবার তওবা করতে হবে।

(৫) তওবা করতে হবে তওবার সময়ের মাঝে। যদি তওবার সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তওবা করা হয় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখন প্রশ্ন হল তওবার সময় পার হয়ে যায় কখন ?

তওবার সময় পার হয়ে যাওয়ার দুটি অবস্থা আছে। একটি সাধারণ অবস্থা অন্যটি বিশেষ অবস্থা।

(ক) সাধারণ অবস্থা : যখন কিয়ামতের আলামত হিসেবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তখন কোন মানুষের তওবা কবুল করা হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (الأنعام : ١٥٨)

'যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই।'[1]

এ আয়াতে 'প্রতিপালকের নিদর্শন'-এর ব্যাখ্যায় রাসূলে কারীম স. যা বলেছেন তা হল সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত হওয়া। অর্থাৎ যখন সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত হবে তখন কোন কাফেরের ইসলাম কবুল করা হবে না এবং পাপী ব্যক্তির তওবা গ্রহণ করা হবে না।

(খ) বিশেষ অবস্থা : যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়। যখন কোন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তওবা করলে তা আল্লাহ গ্রহণ করেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ

[1] সূরা আনআম : ১৫৮

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ (النساء : ١٧-١٨)

'আল্লাহ অবশ্যই সে সব লোকের তওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা করে, এরাইতো তারা যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। তওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে 'আমি এখন তওবা করলাম' এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তো তারা যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।'[1]

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হবে তা হল পাপ বা গুনাহ দু প্রকার। এক প্রকার যা আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত। অন্য প্রকার যা মানুষের অধিকার সম্পর্কিত। মানুষের অধিকার ক্ষুণ্নকারী কোন পাপে যদি কেউ লিপ্ত হয় তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যথাযথ পাওনা পরিশোধ করতে হবে বা তার সাথে মিটমাট করে দাবি ছাড়িয়ে নিতে হবে। অন্যথায় তওবা হবে না। যেমন কেউ অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করল। পরে সে খুব কান্নাকাটি করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করল, এতে কাজ হবে না। যার সম্পদ আত্মসাৎ করা হল তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে তওবা করতে হবে। এমনিভাবে কেউ কাউকে মারপিট করে বা গালি দিয়ে অথবা পরনিন্দা বা গিবত করে কিংবা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার সম্মান ক্ষুণ্ন করল, তা হলে তাকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে ও দাবি ছাড়িয়ে নিতে হবে। যদি তাকে পাওয়া না যায় তবে তার জন্য দোয়া করতে হবে। এ বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে ইমাম নবভী রহ. সহ অনেক উলামায়ে কেরাম এ বিষয়টিকে তওবার জন্য স্বতন্ত্র শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন : তওবার শর্ত তিনটি :—এক. অনুতপ্ত হওয়া, দুই. গুনাহ পরিত্যাগ করা, তিন. ভবিষ্যতে আর করব না বলে দৃঢ় সংকল্প করা। আর যদি গুনাহটি মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে উক্ত গুনাহ থেকে তওবা করার শর্ত চারটি। চতুর্থ শর্ত হল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাওনা আদায় করে তার কাছ থেকে দাবি ছাড়িয়ে নেয়া বা অন্য কোন উপায়ে মিটমাট করে নেয়া।

হজ ও ওমরাহ আদায় করা

---

[1] সূরা নিসা : ১৭-১৮

হজ হল ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران : ٩٧)

'মানুষের মাঝে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।'[1] হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخارى ٨ ومسلم ١٦

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. বলেছেন : **পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এ কথার ঘোষণা দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ করা, রমজানে সিয়াম পালন করা।**[2]

অতএব হজ হল সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ফরজ। তবে ওমরাহ করার হুকুম কি? তা কি ওয়াজিব না সুন্নত ? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হল ওমরাহ করা ওয়াজিব। যেমন হাদিসে এসেছে :—

الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان. (رواه ابن خزيمة، وإسناده قد أخرجه مسلم، لكن لم يسق لفظه، كما قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٦٩٨)

'ইসলাম হল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই ও মোহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, হজ ও ওমরাহ আদায় করবে এবং জানাবাতের (সহবাস, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত ইত্যাদির) পর গোসল করবে, পরিপূর্ণরূপে ওজু করবে ও সিয়াম পালন করবে।[3]

---

[1] সূরা আলে ইমরান : ৯৭

[2] বোখারি- ৮ মুসলিম -১৬

[3] ইবনে খুযাইমা, হাদিসটি মুসলিমের শর্তে সহিহ

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ওমরাহ পালন করা ওয়াজিব। হাদিসে আরো এসেছে—

عن عائشة– رضى الله عنها– قالت: قلت يا رسول الله : على النساء جهاد؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة. رواه ابن ماجة ٢٩٠١ وصححه الألباني ٢٣٤٥

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েদের জন্য কি জিহাদের নির্দেশ রয়েছে ? তিনি বললেন হ্যাঁ, তাদের দায়িত্বে এমন জিহাদ রয়েছে যাতে লড়াই-যুদ্ধ নেই। তা হল হজ ও ওমরাহ।[1]

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মেয়েদের জন্য ওমরাহ ওয়াজিব। যখন মেয়েদের জন্য ওমরাহ ওয়াজিব হল তখন পুরুষদের জন্য তো অবশ্যই।

হজ জীবনে একবার করা ফরজ। হাদিসে এসেছে :—

عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس– رضى الله عنه– سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال : بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. (رواه أبو داود ١٧٢١ و صححه الألباني ١٥١٤)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত সাহাবি আকরা ইবনে হাবিছ রা. রাসূলে কারীম স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল ! হজ কি প্রতি বছর না মাত্র একবার ? তিনি বললেন **: হজ মাত্র একবার করা ফরজ। সুতরাং যে একাধিক হজ করল তা নফল হিসেবে গৃহীত।**[2]

নবী কারীম স. এ দুটি মর্যাদাপূর্ণ এবাদতের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এ দুটি এবাদতে রয়েছে পাপের কুফল থেকে আত্মার পবিত্রতা, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে। তাই নবী কারীম স. বলেছেন :—

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. (رواه البخاري١٤٤٩ ومسلم١٣٥٠)

'যে ব্যক্তি হজ করেছে, তাতে কোন অশ্লীল আচরণ করেনি ও কোন পাপে লিপ্ত হয়নি সে যেন সেই দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে গেল যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছে।'[3] হাদিসে আরো এসেছে—

---

[1] ইবনে মাজা- ৩৯১০, হাটিসটি সহিহ

[2] আবু দাউদ-১৭২১, হাদিসটি সহিহ

[3] বোখারি -১৪৪৯, মুসলিম- ১৩৫০

عن أبي هريرة– رضي الله عنه– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . (رواه البخاري ١٦٨٣ ومسلم١٣٤٩)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. বলেছেন :—

'এক ওমরাহ থেকে অন্য ওমরাহকে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফ্‌ফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কলুষমুক্ত হজের পুরস্কার হল জান্নাত।'[1]

হজ মাবরুর বা কলুষমুক্ত হজ বলা হয় এমন হজকে যার আহকামসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে ও হজের সময় কোন পাপ ও অশ্লীল কাজ করা হয়নি এবং হজের সময়টা ছিল নেক আমল, কল্যাণমূলক কাজে ভরপুর।[2]

একজন মুসলিমের জন্য কর্তব্য হল অতি সত্বর পবিত্র হজ আদায় করে নেয়া। কেননা রাসূলে কারীম স. বলেছেন :—

من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة.. رواه ابن ماجه ٢٨٨٣ وأحمد ٣٥٥ وصححه الألباني ٢٣٣١

'যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছে করল সে যেন তা তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়। হতে পারে তাকে কোন রোগে আক্রান্ত করবে বা বাহন হারিয়ে যাবে অথবা কোন প্রয়োজন দেখা দেবে যা তার হজ আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'[3]

যে একবার ফরজ হজ ও ওমরাহ আদায় করেছে তার জন্য বার বার তা আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা এ দুটি এবাদতে রয়েছে মহা পুরস্কার ও সওয়াব। রাসূলে কারীম স. বলেছেন :—

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. (رواه أحمد ٣٢٣ والترمذي٨١٠ والنسائي ٢٤٦٧ وابن ماجه٢٨٨٣ . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي)

'তোমরা হজ ও ওমরাহ বার বার আদায়ের চেষ্টা কর। কেননা এ দুটো এবাদত দরিদ্রতাকে দূর করে যেমন আগুন লোহা ও স্বর্ণ-রুপার মরিচা দূর করে দেয়।'[4]

---

[1] বোখারি, নং ১৬৮৩, মুসলিম, নং ১৩৪৯
[2] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার
[3] ইবনে মাজা- ২৮৮৩, আহমদ-৩৫৫, হাদিসটি সহিহ
[4] আহমদ- ৩২৩, তিরমিজি- ৮১০, নাসায়ি-২৪৬৭, ইবনে মাজা- ২৮৮৩, হাদিসটি সহিহ

নিয়মিত ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া

অর্থাৎ ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ সময়-মত সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। যেভাবে আদায় করেছেন প্রিয় নবী স.। সকল এবাদতসমূহ তার সুন্নত, মোস্তাহাব ও আদব সহকারে আদায় করা। হাদিসে এসেছে—

عن أبي هريرة– رضى الله عنه– قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى قال : من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته. (رواه البخاري ٦٥٠٢)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সঙ্গে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরজ এবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোন কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে তাতে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি মোমিন বান্দার প্রাণ হরণে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।'[1]**

এ হাদিসে কুদসীতে অনেকগুলো বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর মাঝে একটি হল, ফরজ এবাদত সমূহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর নফল (যা ফরজ নয়) এবাদত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। যদি ফরজ ও নফল এবাদতসমূহ যত্ন সহকারে যথাযথ নিয়মে আদায় করা যায় তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এমন নৈকট্য অর্জন করা যাবে যা তিনি এ হাদিসে উল্লেখ করেছেন। আমরা তার এবাদতে কীভাবে যত্নবান হতে পারি এ সম্পর্কে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার

---

[1] বোখারি-৬৫০২

রহ. বলেন : ফরজসমূহ যত্নের সাথে আদায় করার অর্থ হল : আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তার নির্দেশকে সম্মান করা, মর্যাদা দেয়া, নির্দেশের সামনে শ্রদ্ধায় মস্ত ক অবনত করা, আল্লাহর রবুবিয়্যতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার দাসত্বকে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। আমলগুলো এভাবে যত্ন সহকারে আদায় করতে পারলে আল্লাহর সেই নৈকট্য অর্জন করা যাবে যা তিনি এ হাদিসে বলেছেন।

ফরজ-ওয়াজিবসমূহ যত্ন সহকারে নিয়ম মাফিক আদায় করা এমন একটি গুণ যার প্রশংসা আল্লাহ তাআলা তার কালামে পাকে করেছেন। বলেছেন :—

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (المعارج : ٣٤)

'এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান।'[1]

তাই আসুন ! আমরা এ পবিত্র দিনগুলোতে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের কর্মসূচী বাস্তবায়নের অনুশীলন করে অধিক সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করতে চেষ্টা করি।

বেশি করে নেক আমল করা

নেক আমল সকল স্থানে ও সর্বদাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রিয়। তবে এই বরকতময় দিনগুলোতে নেক আমলের মর্যাদা ও সওয়াব অনেক বেশি।

যারা এ দিনগুলোতে হজ আদায়ের সুযোগ পেলেন তারা তো ভাগ্যবান— সন্দেহ নেই। আর যারা হজে যেতে পারেনি তাদের উচিত হবে এ বরকতময় দিনগুলোকে মর্যাদা দিয়ে বেশি বেশি করে সালাত আদায়, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আযকার, দোয়া-প্রার্থনা, দান-সদকা, মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক গভীর করা, সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের নিষেধ করাসহ প্রভৃতি ভাল কাজ সম্পাদন করা। যেমন ইতিপূর্বে হাদিসে আলোচিত হয়েছে যে বেশি বেশি করে নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ মহব্বত অর্জন করা যায়। (আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে।)

[1] সূরা মাআরিজ : ৩৪

আল্লাহ তাআলার জিকির করা

এ দিন সমূহে অন্যান্য আমলের মাঝে জিকিরের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যেমন হাদিসে এসেছে :—

عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- عن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال : ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. (رواه أحمد ١٣٢ وقال أحمد شاكر :إسناده صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. বলেছেন : **এ দশ দিনে (নেক) আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে আদায় কর।**[1] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (الحج : ٢٨)

'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিন সমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।'[2]

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন : এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলতে যিলহজের প্রথম দশ দিনকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ সময়ে আল্লাহর বান্দাগণ বেশি বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা করেন, তার পবিত্রতা বর্ণনা করেন, তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন, কোরবানির পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করে থাকেন।

উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহত্ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। এ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বাজার সহ সর্বত্র উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা হবে। তবে মেয়েরা নিম্ন-স্বরে পাঠ করবে। তাকবীর হল :—

---

[1] আহমদ-১৩২, হাদিসটি সহিহ

[2] সূরা হজ : ২৮

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ

আজকে আমাদের সমাজে এ সুন্নতটি পরিত্যাজ্য হয়েছে বলে মনে করা হয়। এর আমল দেখা যায় না। তাই আমাদের উচিত হবে এ সুন্নতটির প্রচলন করা। এতে তাকবীর বলার সওয়াব অর্জন হবে ও সাথে সাথে একটি মিটে যাওয়া সুন্নত জীবিত করার সওয়াব পাওয়া যাবে। হাদিসে এসেছে :—

قال رسول الله– صلى الله عليه وسلم– : من أحياء سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا .رواه الترمذي ٦٧٧ وابن ماجه ٢٠٩ صححه الألباني في سنن ابن ماجة ١٧٣

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : 'আমার ইন্তেকালের পরে যে সুন্নতটির মৃত্যু হয়েছে তা যে জীবিত করবে সে ব্যক্তি এ সুন্নত আমলকারীদের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে আমলকারীদের সওয়াবে কোন অংশ কম হবে না।'[1] বোখারিতে এসেছে :—

وكان ابن عمر وأبو هريرة– رضى الله عنهما– يخرجان إلى السوق في أيام العشر ، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. صحيح البخاري ،كتاب العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق.

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও আবু হুরাইরা রা. যিলহজ মাসের প্রথম দশকে বাজারে যেতেন ও তাকবীর পাঠ করতেন, লোকজনও তাদের অনুসরণ করে তাকবীর পাঠ করতেন।[2] অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল স.-এর এই দুই প্রিয় সাহাবি লোকজনকে তাকবীর পাঠের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

মনে রাখতে হবে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ সুন্নত। কিন্তু সকলে একই আওয়াজে জামাতের সাথে তাকবীর পাঠ করবে না। কারণ এটা বেদআত। যেমন একজন বলল : 'আল্লাহু আকবার'। সকলে বলল : 'আল্লাহু আকবার'। কেননা, রাসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কেরাম কখনো এরূপ করেননি। তবে সকলে একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজে তাকবীর পাঠ করতে পারবেন। তবে কাউকে তাকবীর শেখানোর জন্য এ রূপ করা হলে তার কথা আলাদা।

সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা কোন সুন্নত আদায় করতে যেয়ে যেন বেদআতে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। আল্লাহর রাসূল স. ও তার সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সুন্নত সমূহ আদায় করেছেন আমাদের তেমনই করতে হবে। এটাই হল আল্লাহর রাসূলের

---

[1] তিরমিজি-৬৭৭ ও ইবনে মাজা- ২০৯, হাদিসটি সহিহ

[2] বোখারি, ঈদ অধ্যায়

যথার্থ অনুসরণ। আমরা যদি সে সুন্নত আদায় করতে গিয়ে সামান্যতম ভিন্ন পদ্ধতি চালু করি তাহলে তা বেদআত বলে গণ্য হবে। হাদিসে এসেছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

রাসূলে কারীম স. বলেছেন : 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমাদের (ইসলামের) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।'[১]

সিয়াম পালন করা

হাদিসে এসেছে—

عن حفصة- رضى الله عنها- قالت : أربع لم يكن يدعهن النبي- صلى الله عليه وسلم- :

صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد ٦/ ٢٨٧

والنسائي صحيح سنن أبي داود ٢١٠٦ صحيح سنن النسائي ٢٢٣٦

হাফসা রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. কখনো চারটি আমল পরিত্যাগ করেননি। সেগুলো হল : আশুরার সওম, যিলহজের দশ দিনের সওম, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের সওম, ও জোহরের পূর্বের দু রাকাত সালাত।[২]

এ হাদিসে যিলহজের দশ দিনের সওম বলতে নবম তারিখ ও তার পূর্বের সওম বুঝানো হয়েছে। কেননা দশম দিন অর্থাৎ ঈদের দিনে তো রোজা রাখা জায়েজ নেই। ইমাম নববী রহ. বলেন : নবম তারিখে সওম পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাহাব আমল। অপরদিকে আয়েশা রা.-এর একটি উক্তি রয়েছে যে, তিনি বলেছেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে যিলহজের দশ দিনে সওম পালন করতে দেখিনি।'

এ উক্তি সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. বলেন যে আয়েশা রা. এ উক্তিটির ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ স. কোন অসুবিধার কারণে সওম পালন করেননি অথবা তিনি সওম পালন করেছিলেন কিন্তু আয়েশা রা. তা দেখেননি।

আয়েশা রা.-এর বক্তব্য দ্বারা যিলহজের প্রথম নয় দিনে সওম পালন না-জায়েজ হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ পূর্বে আলোচিত হাফসা রা.-এর হাদিসটি মুসবিত তথা একটি আমলকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর আয়েশা রা.-এর বক্তব্যটি

---

[1] বোখারি-২৬৯৮, মুসলিম- ১৭১৮

[2] আহমদ -২৮৭/৬ সহিহ সুনানে আবু দাউদ-২১০৬, সহিহ সুনানে নাসায়ি- ২২৩৬

একটি আমলকে নাফি (নিষেধ) করে। হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী যা মুসবিত (আমল প্রমাণ করে) তা নাফির উপর প্রাধান্য লাভ করে।[১] এ নিয়মানুযায়ী আমলের জন্য হাফসা রা.-এর হাদিস গ্রহণ করা হবে।

অপরদিকে রাসূলে কারীম স. এ দশ দিনে সকল প্রকার নেক আমল পালন করতে উৎসাহিত করেছেন আর সওম অবশ্যই নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। বরং নেক আমলসমূহের মাঝে সওম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন আমল। হাদিসে এসেছে—

عن أبي أمامة- رضى الله عنه- قال: قلت يا رسول الله ! مرني بأمر آخذه عنك، قال : عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. روا النسائي والحاكم وفي رواية للنسائي أن أبا أمامة قال : مرني بعمل، فقال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، صححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٢١٠٠)

সাহাবি আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ স. আমাকে এমন একটি আমলের নির্দেশ দিন যা শুধু আমি আপনার থেকে পাওয়ার অধিকারী হব। **আল্লাহর রাসূল স. বললেন : তুমি সওম (রোজা) পালন করবে। আর এর কোন নজির নেই।**[২]

তবে নাসায়ির আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে আবু উমামা রা. বললেন : আমাকে একটি আমল সম্পর্কে নির্দেশ দিন। তিনি বললেন : **সওম পালন কর। এর সমকক্ষ কোন আমল নেই।** তিনি আবারও বললেন : আমাকে একটি আমল সম্পর্কে নির্দেশ দিন আর রাসূল স. একই উত্তর দিলেন।

এ হাদিস দ্বারা সওম যে এক বড় মর্যাদাসম্পন্ন ও আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল তা আমরা অনুধাবন করতে পারি।

কোন কোন দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, যিলহজ মাসের সাত, আট ও নয় তারিখে সওম পালন করা সুন্নত। কিন্তু সওমের জন্য এ তিন দিনকে নির্দিষ্ট করার কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। যিলহজের ১ থেকে ৯ তারিখে যে কোন দিন বা পূর্ণ নয় দিন সওম পালন করা যেতে পারে। তবে আরাফার দিন অর্থাৎ যিলহজ মাসের নবম তারিখ সওম পালনের ব্যাপারে স্বতন্ত্র নির্দেশনা রয়েছে। হাদিসে এসেছে—

---

[1] যাদুল মাআদ : ইবনুল কায়্যিম

[2] হাকেম ও সহি সুনানে নাসায়ী-২১০০

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :... صيام يوم عرفة

احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ...رواه مسلم ١١٦٣

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেন : **'আরাফার দিনের সওম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।'**[1]

তবে যিলহজ মাসের নবম তারিখে সওম পালন করবেন তারা যারা হজ পালনে রত নন। যারা এ দিনে হজ পালনে ব্যস্ত তাদের সওম পালন করা জায়েজ নয়। কেননা হাদিসে এসেছে :—

روى الإمام أحمد بسنده عن عكرمة، قال: دخلت على أبي هريرة في بيته، فسألته عن صوم يوم

عرفة بعرفات، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات.

ইমাম আহমদ ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আবু হুরাইরা রা.-এর সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম আরাফার দিনে (যিলহজের নবম তারিখে) আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত (হজ পালনে রত) ব্যক্তির সওম পালনের বিধান কি ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ স. আরাফার দিনে আরাফাতে অবস্থানকারীকে সওম পালনে নিষেধ করেছেন।[2]

মুসলিম শরীফের হাদিসে এসেছে : রাসূলে কারীম স. আরাফার দিনে আরাফাতে অবস্থানকালে পানাহার করেছেন। তার সাথে অবস্থানরত লোকজন তা দেখেছেন। [3]

কোরবানি করা

এ দিনগুলোর দশম দিন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কোরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীকে কোরবানি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر: ٢)

'আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন ও কোরবানি করুন।' [4]

---

[1] মুসলিম-১১৬৩

[2] মুসনাদে আহমদ- ২০৪/২, হাকেম ৪৬৫/১, আহমদ শাকের হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

[3] মুসলিম-১১২৩, ১১২৪

[4] সূরা কাওসার : ২

এ আয়াতে ঈদের সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ও কোরবানির পশু জবেহ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ স. সারা জীবন কোরবানির ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। হাদিসে এসেছে :—

قال ابن عمر رضى الله عنه : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. أخرجه أحمد والترمذي، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٢٦١)

সাহাবি ইবনে উমর রা. বলেছেন : নবী কারীম স. দশ বছর মদিনাতে ছিলেন, প্রতি বছর কোরবানি করেছেন।[1]

ঈদের সালাত আদায় করা

এটাও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। একটি মত হল ঈদের সালাত ওয়াজিব। এ মতটাই অধিকতর শক্তিশালী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

মুসলিম হিসেবে কর্তব্য হবে ঈদের সালাতে আগ্রহ সহকারে অংশ গ্রহণ করা, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনা, এবং ঈদের প্রচলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। মনে রাখতে হবে ঈদের দিনটা আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সৎ-কাজ করার দিন। এ দিনটা যেন গান-বাজনা, মদ্য-পান, অশালীন বিনোদন—প্রভৃতি পাপাচারের দিনে পরিণত না করা হয়। কেননা অনেক সময় এ সকল কাজ-কর্ম নেক আমল বরবাদ হওয়ার কারণে পরিণত হয়।

আরাফাহ দিবস

আরাফাহ দিবসের ফজিলত

আরাফাহ দিবস হল এক মর্যাদাসম্পন্ন দিন। যিলহজ মাসের নবম তারিখকে আরাফাহ দিবস বলা হয়। এর ফজিলত ও বিশেষত্বের আলোচনা ইতিপূর্বে ‘যিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত’ অধ্যায়-এ করা হয়েছে।

এ দিনটি অন্যান্য অনেক ফজিলত সম্পন্ন দিনের চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। যে সকল কারণে এ দিবসটির এত মর্যাদা তার কয়েকটি নীচে আলোচিত হল :—

ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা লাভ, বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিন। হাদিসে এসেছে—

[1] আহমদ ও তিরমিজি, আহমদ শাকের হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন

روى الإمام البخاري- رحمه الله- بسنده عن طارق بن شهاب : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر : إني لأعلم حيث أنزلت ، وأين أنزلت، وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت: يوم عرفة وإنا والله بعرفة، (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة : ٣ رواه البخاري ٤٦٠٦

ইমাম বোখারি রহ. তার নিজ সূত্রে তারিক বিন শিহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে ইহুদীরা উমর রা.-কে বলল : আপনারা এমন একটি আয়াত তেলাওয়াত করে থাকেন যদি সে আয়াতটি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তাহলে আমরা সে দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতাম। উমর রা. এ কথা শুনে বললেন : আমি অবশ্যই জানি কখন তা অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে, আর অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ স. কোথায় ছিলেন। হা, সে দিনটি হল আরাফাহ দিবস, আল্লাহর শপথ ! আমরা সে দিন আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। আয়াতটি হল : **আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম**[1]।[2]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে রজব রহ. সহ অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে এ আয়াত নাজিলের পূর্বে মুসলিমগণ ফরজ হিসেবে হজ আদায় করেননি। তাই হজ ফরজ হিসেবে আদায় করার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।[3]

এ দিন হল ঈদের দিন সমূহের একটি দিন। হাদিসে এসেছে :—

روى أبو داود عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. (صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم ٢١١٤)

আবু দাউদ সাহাবি আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : আরাফাহ দিবস, কোরবানির দিন, ও আইয়ামে তাশরীক (কোরবানি পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলামের অনুসারীদের ঈদের দিন। আর এ দিনগুলো খাওয়া-দাওয়ার দিন।[4]

---

[1] সূরা মায়িদাহ : ৩ নং আয়াত

[2] বোখারি, নং ৪৬০৬

[3] লাতায়েফুল মাআরেফ : ইবনে রজব, পৃ-৪৮৬

[4] সহিহ সুনানে আবু দাউদ- ২১১৪

في معنى حديث عمر السابق عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال : فإنها نزلت في عيدين اثنين : في يوم الجمعة ويوم عرفة. (صححه الألباني في سنن الترمذي برقم ٢٤٣٨)

ইতিপূর্বে আলোচিত উমর রা. বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন : সূরা মায়েদার এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে দুটো ঈদের দিনে। তাহল জুমআর দিন ও আরাফাহ দিবস।[1]

এ হাদিস দুটো দ্বারা বুঝে আসে যে আরাফাহ দিবসকে ঈদের দিনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে।

আরাফাহ দিবসের রোজা দু বছরের কাফ্‌ফারা

যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : (يكفر السنة الماضية والباقية) .(رواه مسلم ١١٦٣)

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ স.-কে আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : **'বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।'**[2]

আরাফার দিন গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন

যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول : ما أراد هؤلاء؟

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেন : **'আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন : 'তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায় ?'**[3]

---

[1] সহিহ সুনানে তিরমিজি- ২৪৩৮

[2] মুসলিম-১১৬৩

[3] মুসলিম-১৩৪৮

ইমাম নববী রহ. বলেন : এ হাদিসটি আরাফাহর দিবসের ফজিলতের একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

ইবনে আব্দুল বির বলেন : এ দিনে মোমিন বান্দারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গুনাহগারদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন না। তবে তওবা করার মাধ্যমে ক্ষমা-প্রাপ্তির পরই তা সম্ভব। হাদিসে আরো এসেছে:—

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني شعساً غبراً. أخرجه الإمام أحمد والحاكم واللفظ له، وقال شاكر إسناده صحيح. (المستدرك ١/ ٤٦٥)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন : **'নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরাফাতে অবস্থানকারীদের নিয়ে আসমানের অধিবাসীদের কাছে গর্ব করেন। বলেন : আমার এ সকল বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ ! তারা এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে।'**[1]

আরাফাহ দিবসে যে সকল আমল শরিয়ত দ্বারা প্রমাণিত

এ দিনে রোজা পালন করা। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أبي قتادة- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ... صيام يوم

عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ....(رواه مسلم ١١٦٣)

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেন : **'আরাফার দিনের সওম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।'**[2]

মনে রাখতে হবে আরাফার দিনে সওম তারাই রাখবেন যারা হজ পালনরত নন। যারা হজ পালনে রত তারা আরাফার দিবসে সওম পালন করবেন না। যেমন ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

আরাফার দিনে হজ পালনরত ব্যক্তি রাসূলে কারীম স.-এর আদর্শ অনুসরণ করেই ঐ দিনের সওম পরিত্যাগ করবেন। যেন তিনি আরাফাতে অবস্থানকালীন সময়ে বেশি বেশি করে জিকির, দোয়াসহ অন্যান্য আমলে তৎপর থাকতে পারেন।

---

[1] আহমদ ও হাকেম, হাদিসটি সহিহ

[2] মুসলিম- ১১৬৩

আর এদিনে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে সকল হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। হাদিসে এসেছে—

في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- وفيه (**إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له**) (ورواه المستدرك وقال شاكر إسناده صحيح)

মুসনাদে আহমদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, **এ দিনে যে ব্যক্তি নিজ কান ও চোখের নিয়ন্ত্রণ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে।**[1]

মনে রাখা দরকার যে শরীরের অঙ্গ সমূহ হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে হেফাজত করা যেমন সওমের দাবি তেমনি হজেরও দাবি। কাজেই সর্বাবস্থায় এ দিনে এ বিষয়টির প্রতি যত্নবান হতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধগুলোকে পরিহার করতে হবে।

অধিক পরিমাণে জিকির ও দোয়া করা

নবী কারীম স. বলেছেন :—

خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ(. رواه الترمذي ٢٨٣٧ ورواه مالك في الموطأ وصححه الألباني)

'সবচেয়ে উত্তম দোয়া হল আরাফাহ দিবসের দোয়া। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা যা আমি বলি ও নবীগণ বলেছেন, তাহল : আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই। তিনি একক তার কোন শরিক নেই। রাজত্ব তারই আর সকল প্রশংসা তারই প্রাপ্য, এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'[2]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্দুল বার বলেন : 'এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরাফা দিবসের দোয়া নিশ্চিতভাবে কবুল হবে আর সর্বোত্তম জিকির হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'[3]

ইমাম খাত্তাবী বলেন : এ হাদিস দ্বারা বুঝে আসে যে দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা ও তার মহত্ত্বের ঘোষণা দেয়া উচিত।[1]

---

[1] আহমদ ও হাকেম, হাদিসটি সহিহ

[2] তিরমিজি- ২৮৩৭, মুয়াত্তা মালেক , হাদিসটি সহিহ

[3] আত-তামহীদ : ইবনে আবদুল বার

তাকবীর পাঠ করা

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে যিলহজ মাসের প্রথম দিকের আমলের মাঝে একটি আমল হল সব সময় ও সকল স্থানে তাকবীর পাঠ করা মোস্তাহাব। অবশ্য যে অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা যায় না সে সময় ব্যতীত।

যিলহজ মাসের এ তাকবীরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন : এ তাকবীর আদায়ের পদ্ধতি সাধারণত দু প্রকার।

(এক) আত-তাকবীরুল মুতলাক : অর্থাৎ যে তাকবীর সর্বদা পাঠ করা যেতে পারে। এ তাকবীর যিলহজ মাসের শুরু থেকে ১৩ ই যিলহজ পর্যন্ত দিন রাতের যে কোন সময় আদায় করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

(দুই) আত-তাকবীরুল মুকাইয়াদ : বা বিশেষ সময়ের তাকবীর। সেটা হল ঐ তাকবীর যা সালাতের পরে আদায় করা হয়ে থাকে। আর এ তাকবীরের বিষয়ে দুটি মাসআলা রয়েছে।

(ক) তাকবীর পাঠের শুরু ও শেষ সময় :

এ দ্বিতীয় প্রকার তাকবীর যা সালাতের পরে পাঠ করা হয়ে থাকে তা কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত পাঠ করা হবে এ প্রশ্নে উলামাদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ সকল মতভেদ উল্লেখ করার পর বলেন : 'কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা হবে এ বিষয়ে রাসূলে কারীম স. থেকে স্পষ্ট কোন হাদিস নেই।[2]

এ বিষয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হল যা সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে আলী রা. ও ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে। তাহল যিলহজ মাসের নবম তারিখ থেকে মিনার শেষ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। মুহাদ্দিস ইবনুল মুনজির সহ অনেকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।[3]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন : 'তাকবীর পাঠের সময়সীমার ব্যাপারে এ মতটি হল সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।'[4]

(খ) যে সকল সালাতের পর এ তাকবীর পাঠ করা হবে :

---

[1] শান আদ-দুআ : ইমাম খাত্তাবী পৃ-২০৬

[2] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ৩য় খন্ড পৃ– ৫৩৫

[3] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ৩য় খন্ড পৃ– ৫৩৫

[4] মজমু আল-ফাতাওয়া : ইমাম ইবনে তাইমিয়া। ২৪ তম খন্ড পৃ-২২০

ইমাম বোখারি রহ. তার সহিহ আল-বোখারিতে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'মিনাতে অবস্থানের দিনগুলোতে তাকবীর ও যখন আরাফাতের দিকে রওয়ানা করা হয়।' সে অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : 'উমর রা. মিনাতে সালাতের সময় তাকবীর পাঠ করতেন। মসজিদে অবস্থানকারীগণ তা শুনে তাকবীর পাঠ করতেন। এমনিভাবে যারা বাজারে থাকতেন তারাও তাকবীর পাঠ করতেন, ফলে মিনা উপত্যকা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে যেত। আর ইবনে উমর রা. এ দিনগুলোতে তাকবীর পাঠ করতেন। তাকবীর পাঠ করতেন সালাতের পর, বিছানায় অবস্থানকালে, বাজারে, জনসমাবেশে, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র।'[1]

মাইমুনাহ রা. কোরবানির দিন তাকবীর পাঠ করতেন। মহিলাগণও আবান ইবনে উসমান ও উমর বিন আব্দুল আজিজের পিছনে সালাত আদায় শেষে পুরুষদের সাথে আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে মসজিদে তাকবীর পাঠ করতেন।'

ইমাম বোখারির এ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন : 'সাহাবায়ে কেরামের এ সকল আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোরবানির পূর্ব ও পরবর্তী দিনগুলোতে সালাতের পর তাকবীর পাঠ করা হবে, তেমনি সালাত ব্যতীত অন্যান্য সময়ও তাকবীর আদায় করা হবে।'[2]

এ সকল বিষয় বিবেচনায় তাকবীর পাঠের সময় নিয়ে উলামাদের মাঝে কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়। নীচে মতগুলো তুলে ধরা হল :—

(এক) তাকবীর পাঠ করা হবে সকল ধরনের সালাতের পর।

(দুই) তাকবীর পাঠ করা হবে শুধু ফরজ সালাতের পর। নফল সালাতের পর নয়।

(তিন) তাকবীর পাঠ করবে পুরুষগণ, মহিলাগণ পাঠ করবে না।

(চার) জামাতে সালাত শেষে তাকবীর পাঠ করা হবে। একা একা সালাত আদায় করলে তাকবীর পাঠ জরুরি নয়।

(পাঁচ) কাজা সালাতে তাকবীর পাঠ দরকার নেই।

(ছয়) মুকিম ব্যক্তি তাকবীর আদায় করবে, মুসাফির নয়।

(সাত) শহরের অধিবাসীরা তাকবীর পাঠ করবে, গ্রামের অধিবাসীরা নয়।

---

[1] বোখারি, কিতাবুল ঈদাইন

[2] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ২য় খন্ড পৃ-২৩৬

কিন্তু ইমাম বোখারির উদ্ধৃত আমল দ্বারা বুঝা যায় সর্বাবস্থায়, সকল ধরনের সালাত শেষে, সকলস্থানে, নারী-পুরুষ, মুকিম-মুসাফির. শহরবাসী-গ্রামবাসী নির্বিশেষে সকলে তাকবীর পাঠ করবে।[1]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মত হল সকল সালাতের শেষে তাকবীর পাঠ করবে।[2]

ইমাম বোখারি ও হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝে আসে যে মীনার দিনগুলোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈদের দিনসহ সর্বদা তাকবীর আদায় করা যেতে পারে ও সালাতের পরও তাকবীর আদায় করতে হবে। মিনার দিন বলতে যিলহজ মাসের আট তারিখের জোহর থেকে ১৩ই যিলহজের আসর পর্যন্ত সময়কে বুঝায়।

তাকবীর বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনার সারকথা : তাকবীরের দিন হল যিলহজ মাসের নবম তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত। এ সময়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় তাকবীর পাঠ করা যেতে পারে। সর্বাবস্থার এ তাকবীরকে বলা হয় আত-তাকবীরুল মুতলাক বা সাধারণ তাকবীর। এটাও সুন্নত। আর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ দিনগুলোতে সালাতের পর আদায় করতে হবে। ফরজ সালাত শেষের এ তাকবীরকে বলা হয় আত-তাকবীরুল মুকাইয়াদ বা বিশেষ তাকবীর। আমরা দ্বিতীয়টির ব্যাপারে যত্নবান হলেও প্রথমটির ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। তাই প্রথমটি অর্থাৎ আত-তাকবীরুল মুতলাক প্রচলনের দিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার।

কোরবানির দিন

কোরবানির দিনের ফজিলত

(১) এ দিনের একটি নাম হল ইয়াওমুল হজ্জিল আকবর বা শ্রেষ্ঠ হজের দিন। যে দিনে হাজীগণ তাদের পশু জবেহ করে হজকে পূর্ণ করেন। হাদিসে এসেছে :—

عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر : (أي يوم هذا) ؟ قالوا : يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه أبو داود ١٩٤٥ وصححه الألباني

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. কোরবানির দিন জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন এটা ইয়াওমুন্নাহার বা কোরবানির

---

[1] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ২য় খন্ড পৃ-২৩৭

[2] মজমু আল-ফাতাওয়া : ইমাম ইবনে তাইমিয়া। ২৪ তম খন্ড পৃ-২২০

দিন। রাসূলে কারীম স. বললেন : এটা হল ইয়াওমুল হজ্জিল আকবর বা শ্রেষ্ঠ হজের দিন।[1]

(২) কোরবানির দিনটি হল বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله بن قرط عن النبي– صلى الله عليه وسلم– قال : إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى : يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود ١٧٦٥ وصححه الألباني

আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে কারীম স. বলেছেন : আল্লাহর নিকট দিবস সমূহের মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হল কোরবানির দিন, তারপর পরবর্তী তিনদিন।[2]

(৩) কোরবানির দিনটি হল ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা এ দিনটি বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। এ দিনে সালাত ও কোরবানি একত্র হয়। যা ঈদুল ফিতরের সালাত ও সদকাতুল ফিতরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে কাওসার দান করেছেন। এর শুকরিয়া আদায়ে তিনি তাকে এ দিনে কোরবানি ও সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[3]

কোরবানির দিনের করণীয়

ঈদের সালাত আদায় করা, এর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সুন্দর পোশাক পরিধান করা। তাকবীর পাঠ করা। কোরবানির পশু জবেহ করা ও তার গোশত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা। এ সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন ও সন্তুষ্টি অন্বেষণের চেষ্টা করা। এ দিনটাকে শুধু খেলা-ধুলা, বিনোদন ও পাপাচারের দিনে পরিণত করা কোন ভাবেই ঠিক নয়।

আইয়ামুত-তাশরীক ও তার করণীয়

আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয় কোরবানির পরবর্তী তিন দিনকে। অর্থাৎ যিলহজ মাসের এগারো, বারো ও তেরো তারিখকে আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয়। তাশরীক শব্দের অর্থ শুকানো। মানুষ এ দিনগুলোতে গোশত শুকাতে দিয়ে থাকে বলে এ

---

[1] আবু দাউদ-১৯৪৫, হাদিসটি সহিহ

[2] আবু দাউদ-১৮৬৫, হাদিসটি সহিহ

[3] লাতায়েফুল মাআরিফ : ইবনে রজব র., পৃ- ৪৮২-৪৮৩

দিনগুলোর নাম 'আইয়ামুত-তাশরীক' বা 'গোশত শুকানোর দিন' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

আইয়ামুত তাশরীক এর ফজিলত

এ দিনগুলোর ফজিলত সম্পর্কে যে সকল বিষয় এসেছে তা নীচে আলোচনা করা হল :—

(১) এ দিনগুলো এবাদত-বন্দেগি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির ও তার শুকরিয়া আদায়ের দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

وَاذْكُرُوا اللهَّ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (البقرة : ٢٠٣)

'তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে।'[1]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারি রহ. বলেন :—

قال البخاري : عن أبن عباس رضى الله عنهما ... الأيام المعدودات : أيام التشريق.

(البخاري، كتاب العيدين)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—'নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে আইয়ামুত-তাশরীককে বুঝানো হয়েছে।'[2]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন : ইবনে আব্বাসের এ ব্যাখ্যা গ্রহণে কারো কোন দ্বি-মত নেই।[3] আর মূলত এ দিনগুলো হজের মওসুমে মিনাতে অবস্থানের দিন। কেননা হাদিসে এসেছে—

... أيام منى ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه .(رواه أبو داود ١٩٤٩ وصححه الألباني)

মিনায় অবস্থানের দিন হল তিন দিন। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই।[4] হাদিসে এসেছে—

---

[1] সূরা বাকারা : ২০৩

[2] ফতহুল বারী, ঈদ অধ্যায়

[3] তাফসীর কুরতুবী

[4] আবু দাউদ- ১৯৪৯, হাদিসটি সহিহ

عن نبيشة الهذلي أن رسول الله– صلى الله عليه وسلم– قال : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. (رواه مسلم ١١٤١)

নাবীশা হাজালী থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন : **'আইয়ামুত-তাশরীক হল খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকিরের দিন।'**[1]

ইমাম ইবনে রজব রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন : আইয়ামুত-তাশরীক এমন কতগুলো দিন যাতে ঈমানদারদের দেহের নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের নেয়ামত তথা স্বাচ্ছন্দ্য একত্র করা হয়েছে। খাওয়া- দাওয়া হল দেহের খোরাক আর আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়া হল হৃদয়ের খোরাক। আর এভাবেই নেয়ামতের পূর্ণতা লাভ করল এ দিনসমূহে।[2]

(২) আইয়ামুত-তাশরীকের দিনগুলো ঈদের দিন হিসেবে গণ্য। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عقبة بن عامر– رضى الله عنه– أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. (رواه أبو داود ٢٤١٣ وصححه الألباني)

'সাহাবি উকবাহ ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন: **আরাফাহ দিবস, কোরবানির দিন ও মিনার দিন সমূহ (কোরবানি পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলাম অনুসারীদের ঈদের দিন।'**[3]

(৩) এ দিনসমূহ যিলহজ মাসের প্রথম দশকের সাথে লাগানো। যে দশক খুবই ফজিলতপূর্ণ। তাই এ কারণেও এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে।

(৪) এ দিনগুলোতে হজের কতিপয় আমল সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ কারণেও এ দিনগুলো ফজিলতের অধিকারী।

আইয়ামুত তাশরীকে করণীয়

এ দিনসমূহ যেমনি এবাদত-বন্দেগি, জিকির-আযকারের দিন তেমনি আনন্দ-ফুর্তি করার দিন। যেমন রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **'আইয়ামুত-তাশরীক হল খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর জিকিরের দিন।'**[4]

---

[1] মুসলিম- ১১৪১

[2] লাতায়েফুল মাআরেফ : ইবনে রজব র. পৃ-৫০৪

[3] আবু দাউদ-২৪১৩, হাদিসটি সহিহ

[4] মুসলিম-১১৪১

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেয়া নেয়ামত নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া ও জিকির আদায় করা।

জিকির আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি হাদিসে এসেছে।

(১) সালাতের পর তাকবীর পাঠ করা। এবং সালাত ছাড়াও সর্বদা তাকবীর পাঠ করা। এ তাকবীর আদায়ের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে এ দিনগুলো আল্লাহর জিকিরের দিন। আর এ জিকিরের নির্দেশ যেমন হাজীদের জন্য তেমনই যারা হজ পালনরত নন তাদের জন্যও।

(২) কোরবানি ও হজের পশু জবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করা।

(৩) খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহ তাআলার জিকির করা। আর এটা তো সর্বদা করার নির্দেশ রয়েছে তথাপি এ দিনগুলোতে এর গুরুত্ব বেশি দেয়া। এমনিভাবে সকল কাজ ও সকাল-সন্ধ্যার জিকিরগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া।

(৪) হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তাআলার তাকবীর পাঠ করা।

(৫) এ গুলো ছাড়াও যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা।

ঈদের তাৎপর্য ও করণীয়

ঈদের সংজ্ঞা : ঈদ আরবি শব্দ। এমন দিনকে ঈদ বলা হয় যে দিন মানুষ একত্র হয় ও দিনটি বার বার ফিরে আসে। এটা আরবি শব্দ عاد يعود থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অনেকে বলেন এটা আরবি শব্দ العادة। আদত বা অভ্যাস থেকে উৎপন্ন কেননা মানুষ ঈদ উদযাপনে অভ্যস্ত। সে যাই হোক, যেহেতু এ দিনটি বার বার ফিরে আসে তাই এর নাম ঈদ।

এ শব্দ দ্বারা এ দিবসের নাম রাখার তাৎপর্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ দিবসে তার বান্দাদেরকে নেয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা বার বার ধন্য করেন ও তার এহসানের দৃষ্টি বার বার দান করেন। যেমন রমজানে পানাহার নিষিদ্ধ করার পর আবার পানাহারের আদেশ প্রদান করেন। সদকায়ে ফিতর, হজ-জিয়ারত, কোরবানির গোশত ইত্যাদি নেয়ামত তিনি বার বার ফিরিয়ে দেন। আর এ সকল নেয়ামত ফিরে পেয়ে ভোগ করার জন্য অভ্যাসগত ভাবেই মানুষ আনন্দ-ফুর্তি করে থাকে।

ইসলামে ঈদের প্রচলন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহমত হিসেবে ঈদ দান করেছেন। হাদিসে এসেছে—

عن أنس بن مالك– رضى الله عنهما– قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قد أبدلكم الله خيرا منهما : يوم الأضحى ويوم الفطر)(رواه أبو داود ١١٣٤ ، وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم ١٠٠٤)

'রাসূলুল্লাহ স. যখন মদিনাতে আগমন করলেন তখন মদিনাবাসীদের দুটো দিবস ছিল যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন **এ দু দিনের কি তাৎপর্য আছে ?** মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন : আমরা মূর্খতার যুগে এ দু দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে কারীম স. বললেন : **'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ দু দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন। তা হল ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।'**[1]

শুধু খেলা-ধুলা, আমোদ-ফুর্তির জন্য যে দুটো দিন ছিল আল্লাহ তাআলা তা পরিবর্তন করে এমন দুটো দিন দান করলেন যে দিনে আল্লাহর শুকরিয়া, জিকির, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে শালীন আমোদ-ফুর্তি, সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া করা হবে।

ঈদের তাৎপর্য

ইতিপূর্বে আলোচিত আনাস রা. বর্ণিত হাদিস থেকে ঈদের ফজিলত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। তা হল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উম্মতে মোহাম্মদীকে সম্মানিত করে তাদের এ দুটো ঈদ দান করেছেন। আর এ দুটো দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে তার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইসলামের এ দুটো উৎসবের দিন শুধু শুধু আনন্দ-ফুর্তির দিন নয়। বরং এ দিন দুটোকে আনন্দ-উৎসব-এর সাথে সাথে জগৎ সমূহের প্রতিপালকের এবাদত-বন্দেগি দ্বারা রঙিন করা হবে। যিনি জীবন দান করেছেন, সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন দান করেছেন। যার জন্য জীবন ও মরণ তাকে এ আনন্দের দিনে ভুলে থাকা হবে আর সব কিছু ঠিকঠাক মত চলবে এটা কীভাবে মেনে নেয়া যায় ? তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এবাদত-বন্দেগি, তার প্রতি শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সু-সজ্জিত করেছে। আর ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে ঈদুল-ফিতরের চেয়ে ঈদুল-আজহা শ্রেষ্ঠ।

---

[1] আবু দাউদ- ১১৩৪, হাদিসটি সহিহ

ঈদের দিনের করণীয়

ঈদের দিনে কিছু করণীয় আছে যা নীচে আলোচনা করা হল :—

(১) ঈদের দিন গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সুগন্ধি ব্যবহার

ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মোস্তাহাব। কেননা এ দিনে সকল মানুষ সালাত আদায়ের জন্য মিলিত হয়। যে কারণে জুমআর দিন গোসল করা মোস্তাহাব সে কারণেই ঈদের দিন ঈদের সালাতের পূর্বে গোসল করা মোস্তাহাব। হাদিসে এসেছে—

صح عن ابن عمر– رضى الله عنهما– أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. رواه الإمام مالك ١/ ١٧٧ في أول كتاب العيدين وقال سعيد بن المسيب سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، و الاغتسال. (إرواء الغليل للألباني ٢/ ١٠٤)

ইবনে উমর রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে তিনি ঈদুল-ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।[1] সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. বলেন: ঈদুল ফিতরের সুন্নত তিনটি : ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহের দিকে রওয়ানার পূর্বে কিছু খাওয়া, গোসল করা।[2] এমনি ভাবে সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা মোস্তাহাব। হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله– صلى الله عليه وسلم– (إنما هذه لباس من لا خلاق له). (رواه البخاري رقم ٩٤٨)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে উমর রা. একবার বাজার থেকে একটি রেশমি কাপড়ের জুব্বা আনলেন ও রাসূলে কারীম স.-কে দিয়ে বললেন : আপনি এটা কিনে নিন যা ঈদের সময় ও আগত গণ্যমান্য প্রতিনিধিদের সাথে

[1] মুয়াত্তা ইমাম মালেক- ১৭৭/১

[2] ইরওয়া আল-গলীল : আলবানী, নং ১০৪/২

সাক্ষাতে পরিধান করবেন। রাসূলে কারীম স. বললেন : **'এটা তার পোশাক যার আখেরাতে কোন অংশ নেই।'**[1]

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল রাসূলুল্লাহ স. ঈদের দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সম্মতি দিয়েছেন। আর উক্ত পোশাকটি রেশমি পোশাক হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা ইসলামি শরিয়তে পুরুষদের রেশমি পোশাক পরিধান জায়েজ নয়।

وجاء عن ابن عمر- رضى الله عنهما- بإسناد صحيح: أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. (رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي كما ذكره الحافظ في الفتح ٢/ ٥١٠)

ইবনে উমর রা. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত যে তিনি দু ঈদের দিনে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন।[2]

ইমাম মালেক রহ. বলেন : আমি উলামাদের কাছ থেকে শুনেছি তারা প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাজ-সজ্জাকে মোস্তাহাব বলেছেন।[3]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন : নবী কারীম স. দু ঈদেই ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন।[4]

এ দিনে সকল মানুষ একত্রে জমায়েত হয়, তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হল তার প্রতি আল্লাহর যে নেয়ামত তার প্রকাশ করনার্থে ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ নিজেকে সর্বোত্তম সাজে সজ্জিত করা। হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله عمرو قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. (حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ١٨٨٧)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দার উপর তার প্রদত্ত নেয়ামতের প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন।'**[5]

(২) ঈদের দিনে খাবার গ্রহণ প্রসঙ্গে

---

[1] বোখারি -৯৪৮

[2] ইবনে আবিদ্দুনিয়া, বায়হাকী

[3] আল-মুগনী : ইবনে কুদামা

[4] যাদুল মাআদ : ইবনুল কায়্যিম, ২য় খন্ড, পৃ-৪৪১

[5] সহিহ আল জামে, হাদিস নং ১৮৮৭

সুন্নত হল ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা। আর ঈদুল আজহা-তে ঈদের সালাতের পূর্বে কিছু না খেয়ে সালাত আদায়ের পর কোরবানির গোশত খাওয়া সুন্নত। হাদিসে এসেছে—

عن بريدة– رضي الله عنه– قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، فيأكل من أضحيته. (رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ١٤٢٢)

বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত নবী কারীম স. ঈদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আজহার দিনে ঈদের সালাতের পূর্বে খেতেন না। সালাত থেকে ফিরে এসে কোরবানির গোশত খেতেন।[1]

ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের সালাতের পূর্বে তিনটি, পাঁচটি অথবা সাতটি—এভাবে বে-জোর সংখ্যায় খেজুর খাওয়া সুন্নত। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أنس– رضي الله عنه– قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً. (رواه البخاري ٩٥٣)

সাহাবি আনাস রা. বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন না, আর খেজুর খেতেন বে-জোর সংখ্যায়।[2]

সম্ভবত আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের হুকুম অতি তাড়াতাড়ি আদায় করার ইচ্ছায় রাসূলে কারীম স. এরূপ করতেন। কেননা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম আদায়ের পর আল্লাহর নির্দেশ হল পানাহার করা। এটা করতে যেন দেরি না হয়ে যায় এজন্য তিনি উপস্থিত ভাবে খেজুর হলেও খেয়ে নিতেন।

যিনি কোরবানি দেবেন তার জন্য সুন্নত হল ঈদুল আজহার দিনে প্রথমে কোরবানি দিয়ে তার গোশত খাওয়া। আর যিনি কোরবানি দেবেন না তিনি ঈদের সালাতের পূর্বে কিছু খেতে পারেন।

(৩) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া

[1] আহমদ, সহিহ ইবনে মাজা -১৪২২, হাদিসটি সহিহ

[2] বোখারি - ৯৫৩

ঈদগাহে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। যাতে ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থানে বসা যায় ও ভাল কাজ অতি তাড়াতাড়ি করার সওয়াব অর্জন করা যায়, সাথে সাথে সালাতের অপেক্ষায় থাকার সওয়াব পাওয়া যাবে। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া হল মোস্তাহাব। হাদিসে এসেছে—

عن علي– رضى الله عنه– قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن لا يركب إلا بعذر. (رقم ٥٣٦ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٤٣٧)

আলী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : সুন্নত হল ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন হাদিসটি হাসান। তিনি আরো বলেন : অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ অনুযায়ী আমল করেন। এবং তাদের মত হল পুরুষ ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাবে, এটা মোস্তাহাব। আর গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়া যানবাহনে আরোহণ করবে না।[1]

আর একটি সুন্নত হল যে পথে ঈদগাহে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসবে। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن جابر– رضى الله عنه– قال : كان النبي إذا كان يوم العيد خالف الطريق. (رواه البخاري ٩٨٦)

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম স. ঈদের দিনে পথ বিপরীত করতেন।[2] অর্থাৎ যে পথে ঈদগাহে যেতেন সে পথে ফিরে না এসে অন্য পথে আসতেন। তিনি এটা কেন করতেন—এর ব্যাখ্যায় অনেক উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন হিকমত বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন : যেন ঈদের দিনে উভয় পথের লোকদেরকে সালাম দেয়া ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায় এ কারণে তিনি দুটো পথ ব্যবহার করতেন।

আবার অনেকে বলেছেন ইসলাম ধর্মের শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করার জন্য তিনি সকল পথে আসা-যাওয়া করতেন যেন সকল পথের অধিবাসীরা মুসলিমদের শান-শওকত প্রত্যক্ষ করতে পারে। আবার কেউ বলেছেন গাছ-পালা তরুলতাসহ মাটি যেন অধিক-হারে মুসলিমদের পক্ষে সাক্ষী হতে পারে সে জন্য তিনি একাধিক পথ ব্যবহার করতেন।

---

[1] তিরমিজি - ৫৩৬, হাদিসটি হাসান

[2] বোখারি -৯৮৭

আসল কথা হল হিকমত ও উদ্দেশ্য যাই হোক, আর তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক আমাদের কর্তব্য হল আল্লাহর রাসূল স.-এর সুন্নত অনুসরণ করা।[1]

(৪) ঈদের তাকবীর আদায়

হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ স. ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। যখন সালাত শেষ হয়ে যেত আর তাকবীর পাঠ করতেন না।

আর কোন কোন বর্ণনায় ঈদুল আজহার ব্যাপারে একই কথা পাওয়া যায়।[2]

আরো প্রমাণিত আছে যে ইবনে উমর রা. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদগাহে এসে ইমামের আগমন পর্যন্ত এভাবে তাকবীর পাঠ করতেন।[3]

আগেই আলোচিত হয়েছে যে সুন্নত হল মসজিদ, বাজার, রাস্তা-ঘাট সহ সর্বত্র উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা। কিন্তু দু:খের বিষয় হল মানুষ এ সুন্নাতের প্রতি খুবই উদাসীন। আমাদের সকলের কর্তব্য হবে এ সুন্নতটি সমাজে চালু করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

শেষ রমজানের সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদুল ফিতরের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে। বিশেষভাবে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে যখন বের হবে ও ঈদগাহে সালাতের অপেক্ষায় যখন থাকবে তখন গুরুত্ব সহকারে তাকবীর পাঠ করবে।

আর ঈদুল আজহার সাধারণ তাকবীর শুরু হবে প্রথম যিলহজ থেকে ঈদুল আজহার সালাতের শেষ পর্যন্ত।

আর ঈদুল আজহার বিশেষ তাকবীর শুরু হবে নবম যিলহজের ফজর থেকে। আর শেষ হবে তেরো যিলহজের আসর নামাজের পর। যারা হজ পালনে রত নয় তারা এ নিয়মে তাকবীর পাঠ করবেন। আর যারা হজ পালনে আছেন তারা ঈদের দিনে জোহরের সালাত থেকে তাকবীর শুরু করবেন। কেননা এর পূর্বে তারা তালবীয়া পাঠে ব্যস্ত থাকবেন।[4]

---

[1] যাদুল মাআদ : ইবনুল কায়্যিম

[2] দারে কুতনী, হাদিসটি সহি

[3] দারে কুতনী , ইরওয়াউল গলীল হাদিস নং ৬৫০

[4] ফতহুল বারী, ২য় খন্ড পৃ–৫৩৫

ঈদের সালাত

(১) ঈদের সালাতের হুকুম :

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . (الكوثر: ٢)

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও কোরবানি কর।'[1]

অধিকাংশ মুফাসসিরে কেরামের মতে এ আয়াতে সালাত বলতে ঈদের সালাতকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ স. সর্বদা এ সালাত আদায় করেছেন। কোন ঈদে সালাত পরিত্যাগ করেননি। বরং একে গুরুত্ব দিয়ে তিনি মেয়েদেরকেও এ সালাতে অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أم عطية رضى الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى ، العواتق والحيض وذوات الخدر، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهد الخير، ودعوة المسلمين، قالت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها.(رواه مسلم ٨٩٠)

'উম্মে আতিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ স. আদেশ করেছেন আমরা যেন মেয়েদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাতে সালাতের জন্য বের করে দেই ; পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সবাইকে। কিন্তু ঋতুবতী মেয়েরা সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে তবে কল্যাণ ও মুসলিমদের দোয়া প্রত্যক্ষ করতে অংশ নিবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে রাসূল ! আমাদের মাঝে কারো কারো ওড়না নেই। রাসূলুল্লাহ স. বললেন : **সে তার অন্য বোন থেকে ওড়না নিয়ে পরিধান করবে**।'[2]

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন : ঈদের সালাত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। তবে ফরজ নয়। ইবনে তাইমিয়া রহ. এ মত পোষণ করেন।[3]

---

[1] সূরা কাউসার :২

[2] মুসলিম- ৮৯০

[3] আল-মুগনী : ইবনে কুদামা, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৩৬৭

আর ঈদের সালাত যে ওয়াজিব এর আরেকটা প্রমাণ হল যদি কোন সময় জুমআর দিন ঈদ হয় তখন সে দিন যারা ঈদের সালাত আদায় করেছে তারা জুমআর সালাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

তবে ইমামের কর্তব্য হল ঈদের দিনে শুক্রবার হলে জুমআর সালাতের ব্যবস্থা করবে যাদের আগ্রহ আছে তারা যাতে শরিক হতে পারে।

মনে রাখতে হবে ঈদের দিন জুমআর সালাত পরিত্যাগ করার অনুমতি আছে আর এ অনুমতির ভিত্তিতে কেউ জুমআর সালাত ত্যাগ করলে তার অবশ্যই জোহরের সালাত আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আমল হবে জুমআর দিনে ঈদ হলে জুমআ ও ঈদের সালাত আদায় করা।

কোন অবস্থায় কেউ যেন ঈদের সালাত আদায়ে অলসতা না করে। শিশু-সন্তানদের ঈদের সালাতে নিয়ে যাবে ও ব্যবস্থা থাকলে মেয়েদের যেতে উৎসাহিত করবে। মনে রাখতে হবে ঈদের সালাত ইসলামের একটি শিয়ার তথা মহান নিদর্শন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. বলেছেন : 'প্রত্যেক জাতির এমন কিছু উৎসব থাকে যাতে সকলে একত্র হয়ে নিজেদের শান-শওকত সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করে। ঈদ মুসলিম জাতির এমনি একটি উৎসব। এ কারণেই তো শিশু, মহিলা, এমনকি নারীগণ, যারা সাধারণত ঘরের বাইরে বের হয় না ও ঋতুবতী নারীরা, যাদের সালাত আদায় করতে হয় না—সকলেরই এ দিনে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া মোস্তাহাব।[1]

(২) ঈদের সালাত আদায়ের সময় :

সূর্যোদয়ের পর যখন তা এক লেজা (অর্ধ হাত) পরিমাণ উপরে উঠে তখন থেকে শুরু করে সূর্য ঠিক মাথার উপরে আসা পর্যন্ত সময়টা হল সালাতে ঈদ আদায়ের ওয়াক্ত। এ সময়ের মাঝে যে কোন সময় ঈদের সালাত আদায় করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন : নবী কারীম স. ঈদুল ফিতরের সালাত দেরি করে আদায় করতেন আর ঈদুল আজহার সালাত প্রথম ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।[2]

ঈদুল ফিতরের সালাত একটু দেরিতে আদায় করতেন এ কারণে যে যাতে মুসলিমগণ সদকাতুল ফিতর আদায় করার প্রয়োজনীয় সময় পান।

---

[1] হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগা, ২য় খন্ড, পৃ-২৩

[2] যাদুল-মাআদ, ১ম খন্ড পৃ-৪৪২

আর ঈদুল আজহার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এ কারণে যে মুসলিমগণ সালাত শেষ করে যেন দুপুরের পূর্বে কোরবানির পশু জবেহ সম্পন্ন করতে পারেন।

(৩) ঈদের সালাত কোথায় আদায় করবেন ?

হাদিসে এসেছে :—

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . رواه البخاري برقم ٩٥٦

আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল-আজহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন... ।[1]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন : রাসূলে কারীম স.-এর সুন্নত হল তিনি সর্বদা ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করতেন।[2]

ইবনে কুদামাহ রহ. বলেন : রাসূলুল্লাহ স. কখনো উত্তম কাজ পরিত্যাগ করেননি। কখনো পরিপূর্ণতা বাদ দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তার চেয়ে বড় কথা হল আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে রাসূলে কারীম সা.-এর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব দিকে লক্ষ্য করে আমাদের অবশ্যই ঈদের সালাত ঈদগাহে (উন্মুক্ত প্রান্তরে) আদায় করা উচিত। আর রাসূলে কারীম সা. কখনো ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করেছেন এমন কোন বর্ণনা নেই।

অবশ্য আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণিত একটি হাদিসে জানা যায় রাসূল স. একবার কোন বিশেষ অসুবিধা থাকায় মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেছেন।[3] তবে এ হাদিসটিকে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী দুর্বল বলে প্রমাণ করেছেন। তাই আমাদের অলসতা পরিত্যাগ করে কিছুটা কষ্ট করে হলেও ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

এ দিনে মুসলিমগণ এক সম্মেলনে মিলিত হবেন। মসজিদ এ কাজের জন্য যথাযথ প্রশস্ত হতে পারে না। মসজিদে সালাত আদায়ের ফজিলত থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ স. সর্বদা ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায় করেছেন। এমনিভাবে মসজিদের ফজিলত থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ ঘরে আদায় করা উত্তম।

---

[1] বোখারি- ৯৫৬

[2] যাদুল-মাআদ, ১ম খন্ড, পৃ-৪৪১

[3] আবু দাউদ - ১১৬০ ও ইবনে মাজা -১৩১৩, হাদিসটি সহিহ নয়

(৪) ঈদের সালাতের পূর্বে কোন সালাত নেই

হাদিসে এসেছে :—

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي– صلى الله عليه وسلم– خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها. (رواه البخاري ٩٨٩)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. ঈদুল-ফিতরের দিনে বের হয়ে দু রাকাত ঈদের সালাত আদায় করেছেন। এর পূর্বে ও পরে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।[1]

সুন্নত হল ঈদের সালাতের ওয়াক্তে শুধু ঈদের সালাত আদায় করবে অন্য কোন নফল নামাজ আদায় করবে না। তবে যদি কোন অসুবিধার কারণে ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করতে হয় তাহলে মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা যেতে পারে।

(৫) ঈদের সালাতে কোন আজান ও একামাত নেই

হাদিসে এসেছে :—

عن ابن عباس و جابر– رضى الله عنهما– قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. (رواه البخاري ٩٦٠)

ইবনে আব্বাস ও জাবের রা. থেকে বর্ণিত তারা বলেন : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সালাতে আজান দেয়া হত না।[2]

وعن جابر ابن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. (رواه مسلم٨٨٧)

জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বহু বার রাসূলে কারীম স.-এর সাথে দু ঈদের সালাত আদায় করেছি কোন আজান ও একামত ব্যতীত।[3]

(৬) ঈদের জামাতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের নির্দেশ

---

[1] বোখারি - ৯৮৯

[2] বোখারি-৯৬০

[3] মুসলিম- ৮৮৭

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামাতে ও জুমআর সালাতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. মেয়েদেরকে ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণ করার হুকুম (নির্দেশ) দিয়েছেন। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أم عطية رضى الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى ، العواتق والحيض وذوات الخدر، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قالت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها.(رواه مسلم ٨٩٠)

'উম্মে আতিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সা. আদেশ করেছেন আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাতে সালাতের জন্য বের করে দেই ; পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সহ সকলকেই। কিন্তু ঋতুবতী মেয়েরা (ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে) সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। তবে কল্যাণ ও মুসলিমদের দোয়া প্রত্যক্ষ করতে অংশ নিবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের মাঝে কারো কারো ওড়না নেই। (যা পরিধান করে আমরা ঈদের সালাতে যেতে পারি) রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : সে **তার অন্য বোন থেকে ওড়না নিয়ে পরিধান করবে**।' [1]

দু:খের বিষয় হল আজকে দেখা যায় অনেকে মেয়েদের ঈদের সালাতে অংশ নিতে নিরুৎসাহিত করেন। অনেকে বাধা দেন। আবার কোথাও মহিলাদের জন্য ঈদের সালাতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না বা একে একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। বর্তমান যুগ ফেতনার যুগ, কোন নিরাপত্তা নেই—ইত্যাদি বলে কত অজুহাত সৃষ্টি করা হয়—যাতে মেয়েরা ঈদের সালাতে অংশ না নেয়।

আসলে কোন অজুহাতই এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর রাসূল সা.-এর নির্দেশ ও তাঁর সুন্নাহর বিপরীতে যত অজুহাত ও যুক্তি দেয়া হোক না কেন সবই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যেমন আমরা এ হাদিসটিতে দেখি আল্লাহর রাসূল স. কোন অজুহাত গ্রহণ করেননি। কেউ বলেছিল তার ওড়না নেই। রাসূল সা. বললেন তোমার অন্য বোনের থেকে ধার করে নিবে। এমনকি যারা ঋতুবতী ছিল

---

[1] মুসলিম- ৮৯০

তাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হল যে, তোমরা ঈদগাহে যাবে। সালাত আদায় বৈধ না হওয়া সত্ত্বেও ঈদের জামাত ও সালাত প্রত্যক্ষ করবে।

তাই আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহর রাসূল স.-এর মৃতপ্রায় এ সুন্নতকে বাস্তবায়ন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমাদের মনে রাখতে হবে যুগের ফেতনা ও মেয়েদের ফেতনা সম্পর্কে আমাদের চেয়ে আল্লাহর রাসূল স. অনেক বেশি সচেতন ছিলেন।

(৭) ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের সালাত হল দু রাকাত। হাদিসে এসেছে—

قال عمر رضى الله عنه : صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان. (رواه النسائي وصححه الألباني)

উমর রা. বলেন : জুমআর সালাত দু রাকাত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু রাকাত, ঈদুল আজহার সালাত দু রাকাত ও সফর অবস্থায় সালাত হল দু রাকাত।[1]

ঈদের সালাত শুরু হবে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে। তাকবীরে তাহরীমার পর সাতটি তাকবীর দেবে। কারো মতে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছয়টি তাকবীর দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত পাঁচটি তাকবীর দেবে।

عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. (رواه ابن ماجه وصححه الألباني)

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে দুটো রুকুর তাকবীর বাদে নবী কারীম স. ঈদুল ফিতরের সালাতে সাতটি ও পাঁচটি তাকবীর দিতেন। এ অতিরিক্ত তাকবীরগুলো সুন্নত। এ গুলো পরিত্যাগ করলে সালাত বাতিল হয় না। আর প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাতে হবে। (তবে হানাফী মাজহাব অনুসারীরা অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীরের সাথে ঈদের নামাজ আদায় করেন। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট ঈদের সালাতের ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর ওয়াজিব)

তাকবীরসমূহ আদায় করার পর সুরা ফাতেহা পড়বে, তারপর প্রথম রাকাতে সূরা আলা পড়বে আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাসিয়াহ পড়বে। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফ পড়বে আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ক্বামার পড়বে।[1]

---

[1] নাসায়ি- ১৩৪৬, হাদিসটি সহিহ

সালাত শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব খুতবা দেবেন। মনে রাখা দরকার ঈদের খুতবা হবে সালাত আদায়ের পর সালাত আদায়ের পূর্বে কোন খুতবা নেই। হাদিসে এসেছে—

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم .(رواه البخاري ٩٥٦)

আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। ঈদগাহে প্রথম সালাত শুরু করতেন। সালাত শেষে মানুষের দিকে ফিরে খুতবা দিতেন, এ খুতবাতে তিনি তাদের ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন, বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। আর এ অবস্থায় মানুষেরা তাদের কাতারে বসে থাকত।[2]

এ হাদিস দ্বারা যে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হল তার মাঝে : ঈদের সালাতের পূর্বে কোন ওয়াজ-নসিহত বা খুতবা হবে না। ইমাম সাহেব ঈদগাহে এসেই সালাত শুরু করে দেবেন।

(৮) ঈদের খুতবা শ্রবণ

সালাতের পর ইমাম দুটো খুতবা দেবেন। সে খুতবাতে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা ও গুন-গান, অধিক পরিমাণে তাকবীর পাঠ করবেন। তবে সালাত আদায়কারীকে ঈদের খুতবা শুনতেই হবে এমন কথা নেই। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. (رواه أبو داود ١١٥٥ وصححه الألباني)

আব্দুল্লাহ বিন সায়েব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি নবী কারীম স.-এর সাথে ঈদ উদযাপন করলাম। যখন তিনি ঈদের সালাত শেষ করলেন, বললেন : **আমরা এখন খুতবা দেব। যার ভাল লাগে সে যেন বসে আর যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে।**[3]

---

[1] মুসলিম- ৮৭৮

[2] বোখারি-৯৫৬

[3] আবু দাউদ- ১১৫৫, হাদিসটি সহিহ

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে খুতবা শ্রবণ করায় অনেক সওয়াব রয়েছে। তাতে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির আছে, দ্বীনি শিক্ষা বিষয়ক কথা-বার্তা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ফেরেশতাদের আগমন ও আল্লাহ তাআলার সাকীনা ও রহমত।

(৯) ঈদের সালাতের কাজা আদায় প্রসঙ্গে

কারো যদি ঈদের সালাত ছুটে যায় তাহলে সে কি করবে। কাজা করা দরকার কিনা ? এ বিষয়ে উলামাদের একাধিক মত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হল কাজা আদায় করবে।

এরপর কথা থেকে যায়, সে কাজা আদায় করতে যেয়ে কত রাকাত আদায় করবে। চার রাকাত না দু রাকাত ? এ বিষয়ে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মত।

ইমাম বোখারি রহ. বলেছেন : 'যদি ঈদের সালাত ধরতে না পারে তবে দু রাকাত কাজা আদায় করবে। আতা রহ. বলেছেন : যদি ঈদের সালাত ছুটে যায় তবে কাজা হিসেবে দু রাকাত আদায় করবে।'

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন : 'যদি ঈদের সালাত ছুটে যায় তবে ইমামের সাথে দু রাকাত আদায় করবে।' অর্থাৎ কাজা করবে জামাতের সাথে। মূলত দু রাকাত কাজা আদায় করা যুক্তি সংগত। ইমাম মুযনী সহ একদল ফিকাহবিদ বলেছেন ঈদের সালাত ছুটে গেলে তা কাজা করার প্রয়োজন নেই।

আর ইমাম সওরী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন যদি কেউ একা একা ঈদের সালাতের কাজা আদায় করে তবে সে দু রাকাত আদায় করবে। আর যদি জামাতের সাথে আদায় করে তবেও দু রাকাত। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন যে জামাতে ঈদের সালাত পেল না সে চার রাকাত কাজা আদায় করবে। (বিশুদ্ধ সূত্রে সাঈদ বিন মানসূর বর্ণিত)

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন : 'যদি কেউ ঈদের সালাত কোন কারণে পরিত্যাগ করে তবে সে ইচ্ছা করলে কাজা আদায় করতে পারে, আর না করলে কোন অসুবিধা নেই। যদি আদায় করে তবে চার রাকাতও আদায় করতে পারে আবার দু রাকাতও।'[1]

(১০) ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ভাষা

[1] ফাতহুল বারী : ঈদ অধ্যায়

একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো, অভিবাদন করা মানুষের সুন্দর চরিত্রের একটি দিক। এতে খারাপ কিছু নেই। বরং এর মাধ্যমে একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা ও দোয়া করা যায়। পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

ঈদ উপলক্ষ্যে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরিয়ত অনুমোদিত একটি বিষয়। বিভিন্ন বাক্য দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। যেমন :—

(ক) হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন : 'যুবাইর ইবনে নফীর থেকে সঠিক সূত্রে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স.-এর সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অপরকে বলতেন—

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

'আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনার ভাল কাজগুলো কবুল করুন।'[1]

(খ) ঈদ মুবারক বলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়।

(গ) প্রতি বছরই আপনারা ভাল থাকুন :—

كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ

—বলা যায়।

এ ধরনের সকল মার্জিত বাক্যের দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। তবে প্রথমে উল্লেখিত বাক্য—

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

—দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করা উত্তম। কারণ সাহাবায়ে কেরাম রা. এ বাক্য ব্যবহার করতেন ও এতে পরস্পরের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া রয়েছে। আর যদি কেউ সব বাক্যগুলো দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করতে চায় তাতে অসুবিধা নেই। যেমন ঈদের দিন দেখা হলে বলবে—

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ، كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ، عِيْدُكَ مُبَارَكٌ

'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার ও আপনার সৎ-কর্ম সমূহ কবুল করুন। সারা বছরই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাকে বরকতময় ঈদের শুভেচ্ছা।'

(১১) আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেয়া ও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া :

সদাচরণ পাওয়ার দিক দিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি হকদার হল মাতা ও পিতা। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকল প্রকার মনোমালিন্য দুর করার

[1] ফাতহুল বারী : ঈদ অধ্যায়

জন্য ঈদ হল বিরাট সুযোগ। কেননা হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক এমন একটা বিষয় যা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। হাদিসে এসেছে—

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا ! أنظروا هذين حتى يصطلحا ! أنظروا هذين حتى يصطلحا !. رواه مسلم٢٥٦٥

আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তাকে ব্যতীত সে দিন সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু ঐ দু ভাইকে ক্ষমা করা হয় না যাদের মাঝে হিংসা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তখন (ফেরেশতাদেরকে) বলা হয় এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়! এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়!! এ দুজনকে অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলে মিশে যায়!!! (তাহলে তাদেরও যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়)**[1]

এ হাদিস দ্বারা এতটুকু অনুধাবন করা যায় যে নিজেদের মাঝে হিংসা, বিবাদ, দ্বন্দ্ব রাখা এত বড় অপরাধ যার কারণে আল্লাহর সাধারণ রহমত তো বটেই বিশেষ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। হাদিসে আরো এসেছে—

عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. (رواه مسلم٢٥٦٠)

আবু আইউব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে তার ভাইকে তিন দিনের বেশি সময় বয়কট করবে বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। তাদের অবস্থা এমন যে দেখা সাক্ষাৎ হলে একজন অন্য জনকে এড়িয়ে চলে। এ দুজনের মাঝে ঐ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে প্রথম সালাম দেয়।**[2]

---

[1] মুসলিম-২৫৬৫

[2] মুসলিম-২৫৬০

এ সকল হাদিসে ভাই বলতে শুধু আপন ভাইকে বুঝানো হয়নি বরং সকল মুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। হোক সে ভাই অথবা প্রতিবেশী কিংবা চাচা বা বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, সহপাঠী বা অন্য কোন আত্মীয়।

তাই, যার সাথে ইতিপূর্বে ভাল সম্পর্ক ছিল এমন কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক খারাপ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায়। যদি কেউ এমন অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তার এ অন্যায় থেকে ফিরে আসার এক মহা সুযোগ হল ঈদ।

ঈদে যা বর্জন করা উচিত

ঈদ হল মুসলিমদের শান-শওকত প্রদর্শন, আত্মার পরিশুদ্ধি, তাদের ঐক্য সংহতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। কিন্তু দু:খজনক হল বহু মুসলিম এ দিনটাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে জানে না। তারা এ দিনে বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এ ধরনের কিছু কাজ-কর্মের আলোচনা পেশ করা হল :

(১) কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন কাজ বা আচরণ করা

মুসলিম সমাজে এ ব্যাধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে তারা যেমন সাংস্কৃতিক দৈন্যতার পরিচয় দিচ্ছে অপর দিকে নিজেদের তাহজিব-তামাদ্দুনের প্রতি অনীহা দেখাচ্ছে।

এ ধরনের আচরণ ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود ٤٠٣١ وصححه الألباني

সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।**[1]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হল যে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে কাফের হয়ে যাবে। যদি এ বাহ্যিক অর্থ (কুফরির হুকুম) আমরা নাও ধরি তবুও কমপক্ষে এ কাজটি হারাম তো হবেই।[2]

(২) পুরুষ কর্তৃক মহিলার বেশ-ধারণ করা ও মহিলা কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ

---

[1] আবু দাউদ- ৪০৩১, হাদিসটি সহিহ

[2] ইকতেজাউ সিরাতিল মুস্তাকীম : ইমাম ইবনে তাইমিয়া। ১ম খন্ড, পৃ-২৪১

পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের মহিলার বেশ ধারণ ও মহিলার পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদিসে এসেছে—

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. رواه أبو داود ٤٠٩٧ وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم ٣٤٥٣

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. ঐ সকল মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ঐ সকল পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন যারা মহিলার বেশ ধারণ করে।[1]

(৩) ঈদের দিনে কবর জিয়ারত

কবর জিয়ারত করা শরিয়ত সমর্থিত একটি নেক আমল। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجراً. (صحيح الجامع رقم ٤٥٨٤)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন : **আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, হা, এখন তোমরা কবর জিয়ারত করবে। কারণ কবর জিয়ারত হৃদয়কে কোমল করে, নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে তোমরা শোক ও বেদনা প্রকাশ করতে কিছু বলো না।**[2]

কিন্তু ঈদের দিনে কবর জিয়ারতকে অভ্যাসে পরিণত করা বা একটা প্রথা বানিয়ে নেয়া শরিয়তসম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :—

لا تجعلوا قبري عيداً ... (رواه أبو داود و ٢٠٤٢ صححه الألباني)

তোমরা আমার কবরে ঈদ উদযাপন করবে না বা ঈদের স্থান বানাবে না... ।[3]

যদি ঈদের দিনে কবর জিয়ারত করা হয় তবে কবরে ঈদ উদযাপন বলে গণ্য হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে 'ঈদ' মানে যা বার বার আসে। প্রতি বছর অথবা প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে।

---

[1] আবু দাউদ- ৪০৯৭, হাদিসটি সহিহ

[2] সহিহ আল-জামে হাদিস নং ৪৫৮৪

[3] আবু দাউদ-২০৪২, হাদিসটি সহিহ

যদি বছরের কোন একটি দিনকে কবর জেয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় আর তা প্রতি বছরে করা হয় তা হলে এর নামই হল কবরে ঈদ উদযাপন। আর সেটা যদি সত্যিকার ঈদের দিনে হয় তবে তা আরো মারাত্মক বলে ধরে নেয়া যায়।

যখন আল্লাহ তাআলার রাসূলের কবরে ঈদ পালন নিষিদ্ধ তখন অন্যের কবরে ঈদ উদযাপন করার হুকুম কতখানি নিষিদ্ধের পর্যায়ে পড়ে তা একটু অনুমান করা যেতে পারে।

(৪) বেগানা মহিলা পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

যেমন :

(ক) মহিলাদের খোলা-মেলা অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া।

মনে রাখা প্রয়োজন যে খোলামেলা ও অশালীন পোষাকে রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب : ٣٣)

'আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতার যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'[1] হাদিসে এসেছে—

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (رواه مسلم ٢١٢٨)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ স. **বলেছেন : জাহান্নাম-বাসী দু ধরনের লোক যাদের আমি এখনও দেখতে পাইনি। (আমার যুগের পরে দেখা যাবে) একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে। আর একদল স্ত্রীলোক যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রার মত হবে, অন্যদের আকর্ষণ করবে ও অন্যেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না যদিও তার সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।**[2]

(খ) মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

[1] সূরা আহযাব : ৩৩

[2] মুসলিম- ২১২৮

দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই গুনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করা হয়। নিকট আত্মীয়দের মাঝে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শরিয়ত অনুমোদিত নয় তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ অবাধে করা হয়। হাদিসে এসেছে—

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله قال : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفريت الحمو؟ قال : الحمو : الموت. (رواه مسلم ٢١٧٢)

সাহাবি উকবাহ ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন: **তোমরা মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে। মদিনার আনসারদের মধ্য থেকে এক লোক প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসূল ! দেওর-ভাশুর প্রমুখ আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি উত্তরে বললেন : এ ধরনের আত্মীয়-স্বজন তো মৃত্যু ।**[1]

এ হাদিসে 'হামউ' শব্দ নেয়া হয়েছে। এর অর্থ এমন সকল আত্মীয় যারা স্বামীর সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতম যেমন স্বামীর ভাই, তার মামা, খালু প্রমুখ। তাদেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করার কারণ হল এ সকল আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমেই বে-পরদাজনিত বিপদ আপদ বেশি ঘটে থাকে। যেমনটি অপরিচিত পুরুষদের বেলায় কম ঘটে।

(৫) গান-বাদ্য

ঈদের দিনে এ গুনাহের কাজটাও বেশি হতে দেখা যায়। গান ও বাদ্যযন্ত্র যে শরিয়তে নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আবার যদি হয় অশ্লীল গান তাহলে তো তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন ভিন্নমত নেই। হাদিসে এসেছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليكون أقواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. (رواه البخاري تعليقا بصورة الجزم، يرقم ٥٥٩٠)

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **আমার উম্মতের মাঝে এমন একটা দল পাওয়া যাবে যারা ব্যভিচার, রেশমি পোশাক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল (বৈধ) মনে করবে।**[2]

এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় গান-বাদ্য নিষিদ্ধ। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে 'তারা হালাল মনে করবে।' এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মূলত এটা হারাম।

---

[1] মুসলিম-২১৭২

[2] বোখারি- ৫৫৯০

ইসলামি শরিয়ত কিছু কিছু পর্বে বিনোদনের অনুমতি দিয়েছে। তাই অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কয়েকটি সময়ে দফ (একদিকে খোলা ঢোল জাতীয় বাদ্য) বাজানোকে জায়েজ বলেছেন।

(ক) বিবাহের অনুষ্ঠানে। হাদিসে এসেছে—

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين .(رواه البخاري٥١٤٧)

রবী বিনতে মুয়াওয়াজ রা. বর্ণনা করেন : যখন আমার বিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ স. আমার কাছে এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন যেমন তুমি বসেছ। তখন কয়েকজন বালিকা দফ বাজাচ্ছিল ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের প্রশংসামূলক সংগীত গাচ্ছিল। এ সংগীতের মাঝে এক বালিকা বলে উঠল 'আমাদের মাঝে এমন এক নবী আছেন যিনি জানেন আগামী কাল কি হবে।' তখন আল্লাহর রাসূল স. বললেন: **'এ কথা বাদ দাও এবং যা বলছিলে তা বল।'**[1]

(খ) ঈদের সময়ে। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ؟ وذلك يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا** (رواه البخاري ٩٥٢)

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত একদিন আবু বকর রা. আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন দু জন আনসারী বালিকা বুয়াছ যুদ্ধে তাদের বীরত্ব সম্পর্কিত গান গাচ্ছিল, কিন্তু তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবু বকর রা. বললেন : 'আশ্চর্য, আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের বাদ্য !' এদিনটা ছিল ঈদের দিন। আবু বকর রা.-এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ স. বললেন : **'হে আবু বকর ! প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে, আর এদিন হল আমাদের ঈদ।'**[2]

---

[1] বোখারি- ৫১৪৭

[2] বোখারি-৯৫২

কোরবানি : তাৎপর্য ও আহকাম

পশু উৎসর্গ করা হবে এক আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে যার কোন শরিক নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তার এবাদত করার জন্য। যেমন তিনি বলেন :—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : ٥٦)

'আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা শুধু আমার এবাদত করবে।'[1] আল্লাহ তাআলা তার এবাদতের জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করলেন।

এবাদত বলে—

لفظ شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.

—যে সকল কথা ও কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন; হোক সে কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে।[2] আর এ এবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা। এ কাজটি তিনি শুধু তার উদ্দেশ্যে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন :—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. (الأنعام : (١٦٣-١٦٢)

'বল, আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোন শরিক নাই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।'[3]

ইবনে কাসীর রহ. বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছেন যে সকল মুশরিক আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু জবেহ করে তাদের যেন জানিয়ে দেয়া হয় আমরা তাদের বিরোধী। সালাত, কোরবানি শুধু তার নামেই হবে যার কোন শরিক নাই। এ কথাই আল্লাহ তাআলা সূরা কাওসারে বলেছেন :—

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কোরবানি কর।'[1]

---

[1] সূরা জারিয়াত : ৫৬

[2] ফতহুল মজিদ : ১৭

[3] সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩

অর্থাৎ তোমার সালাত ও কোরবানি তারই জন্য আদায় কর। কেননা মুশরিকরা প্রতিমার উদ্দেশে প্রার্থনা করে ও পশু জবেহ করে। আর সকল কাজে এখলাস অবলম্বন করতে হবে। এখলাসের আদর্শে অবিচল থাকতে হবে।

যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু উৎসর্গ বা জবেহ করবে তার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা হাদিসে এসেছে—

আবু তোফায়েল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি আলী ইবনে আবি তালেবের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল : 'নবী কারীম স. গোপনে আপনাকে কি বলেছিলেন ?' বর্ণনাকারী বলেন : আলী রা. এ কথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন : 'নবী কারীম স. মানুষের কাছে গোপন রেখে আমার কাছে একান্তে কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি বলল : 'হে আমিরুল মোমিনীন ! সে চারটি কথা কি ? তিনি বললেন :

لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. (رواه مسلم)

'১. যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবেহ করে আল্লাহ তার উপর লা'নত করেন। ৩. ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ লা'নত করেন যে ব্যক্তি কোন বেদআতীকে প্রশ্রয় দেয়। ৪. যে ব্যক্তি জমির সীমানা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাকে লা'নত করেন।[2]

এ কাজগুলো এমন, যে ব্যক্তি তা করল সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কুফরির সীমানায় প্রবেশ করল।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবেহ করার অর্থ এমন, যেমন কোন ব্যক্তি প্রতিমার নামে জবেহ করল অথবা কোন নবীর নামে জবেহ করল বা কাবার নামে জবেহ করল। এ ধরনের যত জবেহ হবে সব না-জায়েজ ও তা খাওয়া হারাম। জবেহকারী মুসলিম হোক বা অমুসলিম।

যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করা হয় তা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে:

---

[1] সূরা কাওসার : ২

[2] মুসলিম, শরহে নববী

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ (المائدة : ٣)

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে জবেহকৃত পশু আর শ্বাস রোধে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু ; তবে যা তোমরা জবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব হল পাপ-কার্য... ।[1]

ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন যা কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করা হয় তা যে হারাম এ ব্যাপারে মুসলিমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবেহ করে সে জাহান্নামে যাবে। যেমন হাদিসে এসেছে :—

عن سلمان قال :دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، قالوا : وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيئ أقرب، قالوا له : قرب ولو ذبابا، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأحمد في الزهد، والحديث موقوف على سلمان بسند صحيح.

সালমান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে একটি মাছির কারণে। অন্য এক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে একটি মাছির কারণে। এ কথা শুনার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করল এটা কীভাবে হবে ? তিন বললেন : দু ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সম্প্রদায়ের নিয়ম হল যে ব্যক্তি তাদের কাছ দিয়ে যাবে তাকে তাদের প্রতিমার উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করতে হবে। সে সম্প্রদায়ের লোকেরা এ দুজনের একজনকে বলল : আমাদের এ প্রতিমার জন্য কিছু উৎসর্গ কর ! লোকটি উত্তর দিল আমার কাছে তো এমন কিছু নেই যা আমি এ প্রতিমার জন্য উৎসর্গ করতে পারি। তারা বলল একটি মাছি হলেও

[1] সূরা মায়িদাহ ঃ ৩

উৎসর্গ কর। সে একটি মাছি উৎসর্গ করল। তারা তাকে ছেড়ে দিল। ফলে সে জাহান্নামে যাবে।

তারপর তারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অনুরূপ কথা বলল। সে উত্তরে বলল আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কিছু উৎসর্গ করি না। তারা তাকে হত্যা করল। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করল।[1]

বর্ণিত এ হাদিস থেকে আমারা কয়েকটি শিক্ষা লাভ করতে পারি

(১) শিরক কত বড় মারাত্মক অপরাধ তা অনুধাবন করা যায়। যদি তা খুব সামান্য বিষয়েও হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন :—

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.(المائدة : ٧٢)

'যে আল্লাহর সাথে শরিক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'[2]

(২) যে লোকটি জাহান্নামে গেল সে কিন্তু উক্ত কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু সে মুশরিকদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কাজটি করেছিল।

(৩) যে লোকটি জাহান্নামে গেল সে মুসলিম ছিল, কিন্তু সামান্য বিষয়ে শিরক করার কারণে জাহান্নামে গেল।

(৪) তাওহীদ ও এখলাসের ফজিলত কত বেশি তা অনুধাবন করা যায়।

(৫) যে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল সে তাওহীদের জন্য নির্যাতন সহ্য করল, নিহত হল তবু শিরকের সাথে আপোশ করল না।

কোরবানির অর্থ ও তার প্রচলন

কোরবানি বলা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন ও তার এবাদতের জন্য পশু জবেহ করা। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা তিন প্রকার হতে পারে :

১. হাদী ২. কোরবানি ৩. আকীকাহ

তাই কোরবানি বলা হয় ঈদুল আজহার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহপালিত পশু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য জবেহ করা।

ইসলামি শরিয়তে এটি এবাদত হিসেবে সিদ্ধ, যা কোরআন, হাদিস ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত। কোরআন মজীদে যেমন এসেছে :—

---

[1] আবু নঈম, আহমদ

[2] সূরা মায়েদা : ৭২

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কোরবানি কর।'[1]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. (الأنعام : (١٦٣-١٦٢)

'বল, আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোন শরিক নাই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।'[2]

হাদিসে এসেছে :—

عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين. (روه البخاري ٥٥٤٥ ومسلم ١٩٦١)

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **যে ঈদের সালাতের পর কোরবানির পশু জবেহ করল তার কোরবানি পরিপূর্ণ হল ও সে মুসলিমদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল।**[3]

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما (رواه البخاري ٥٥٦٥ ومسلم ١٩٦٦) وفي لفظ البخاري أقرنين قبل أملحين.

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল স. নিজ হাতে দুটি সাদা কালো বর্ণের দুম্বা কোরবানি করেছেন। তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলেছেন। তিনি পা দিয়ে দুটো কাঁধের পাশ চেপে রাখেন।[4] তবে বোখারিতে 'সাদা-কালো' শব্দের পূর্বে 'শিংওয়ালা' কথাটি উল্লেখ আছে

[1] সূরা কাওসার : ২

[2] সূরা আনআম ঃ ১৬২-১৬৩

[3] বোখারি- ৫৫৪৫, মুসলিম-১৯৬১

[4] বোখারি-৫৫৬৫, মুসলিম-১৯৬৬

কোরবানির বিধান

কোরবানির হুকুম কি ? ওয়াজিব না সুন্নত ? এ বিষয়ে ইমাম ও ফকীহদের মাঝে দুটো মত রয়েছে।

প্রথম মত : কোরবানি ওয়াজিব। ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস, ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রমুখের মত এটাই। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. থেকে একটি মত বর্ণিত আছে যে তারাও ওয়াজিব বলেছেন।

দ্বিতীয় মত : কোরবানি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এটা অধিকাংশ উলামাদের মত। এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহ.-এর প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু এ মতের প্রবক্তারা আবার বলেছেন : সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কোরবানি পরিত্যাগ করা মাকরূহ। যদি কোন জনপদের লোকেরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে কোরবানি পরিত্যাগ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কেননা, কোরবানি হল ইসলামের একটি শিয়ার বা মহান নিদর্শন।[1]

যারা কোরবানি ওয়াজিব বলেন তাদের দলিল :

(এক) আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন :—

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কোরবানি কর।'[2]

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ পালন ওয়াজিব হয়ে থাকে।

(দুই) রাসূলে কারীম স. বলেছেন :—

من وجد سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم.

'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে না আসে।'[3]

যারা কোরবানি পরিত্যাগ করে তাদের প্রতি এ হাদিস একটি সতর্ক-বাণী। তাই কোরবানি ওয়াজিব।

(তিন) রাসূলে কারীম স. বলেছেন :—

---

[1] আহকামুল উযহিয়্যা : মুহাম্মদ বিন উসাইমীন, পৃ- ২৬

[2] সূরা কাওসার : ২

[3] মুসনাদ আহমাদ, ইবনে মাজা- ৩১২৩ হাদিসটি হাসান

يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية . . رواه أحمد وابن ماجه ٣١٢٥ ، حسنه الألباني

হে মানব সকল ! প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব হল প্রতি বছর কোরবানি দেয়া।[1]

যারা কোরবানি সুন্নত বলেন তাদের দলিল :

(এক) রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :—

إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره، حتى يضحي .رواه مسلم ١٩٧٧

'তোমাদের মাঝে যে কোরবানি করতে চায়, যিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন কোরবানি সম্পন্ন করার আগে তার কোন চুল ও নখ না কাটে।'[2]

এ হাদিসে রাসূল স.-এর 'যে কোরবানি করতে চায়' কথা দ্বারা বুঝে আসে এটা ওয়াজিব নয়।

(দুই) রাসূল স. তার উম্মতের মাঝে যারা কোরবানি করেনি তাদের পক্ষ থেকে কোরবানি করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে কোরবানি ওয়াজিব নয়।

শাইখ ইবনে উসাইমীন রহ. উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করার পর বলেন: এ সকল দলিল-প্রমাণ পরস্পর বিরোধী নয় বরং একটা অন্যটার সম্পূরক।

সারকথা হল যারা কোরবানিকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের প্রমাণাদি অধিকতর শক্তিশালী। আর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত এটাই।

কোরবানির ফজিলত

(ক) কোরবানি দাতা নবী ইবরাহিম আ. ও মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

(খ) পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কোরবানি দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :—

لَنْ يَنَالَ اللهَّ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. (الحج : ٣٧)

---

[1] মুসনাদ আহমাদ, ইবনে মাজা- ৩১২৫ হাদিসটি হাসান

[2] মুসলিম- ১৯৭৭

'আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন ; সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে।'[1]

(গ) পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অভাবীদের আনন্দ দান। আর এটা অন্য এক ধরনের আনন্দ যা কোরবানির গোশতের পরিমাণ টাকা যদি আপনি তাদের সদকা দিতেন তাতে অর্জিত হত না। কোরবানি না করে তার পরিমাণ টাকা সদকা করে দিলে কোরবানি আদায় হবে না।

কোরবানির শর্তাবলি

(১) এমন পশু দ্বারা কোরবানি দিতে হবে যা শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেগুলো হল উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। এ গুলোকে কোরআনের ভাষায় বলা হয় 'বাহীমাতুল আনআম।' যেমন এরশাদ হয়েছে :—

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ . (الحج : ٣٤)

'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানির নিয়ম করে দিয়েছি ; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।'[2] হাদিসে এসেছে :—

عن جابر– رضى الله عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن. (رواه مسلم ١٩٦٣)

'তোমরা অবশ্যই নির্দিষ্ট বয়সের পশু কোরবানি করবে। তবে তা তোমাদের জন্য দুষ্কর হলে ছয় মাসের মেষ-শাবক কোরবানি করতে পার।'[3] আর আল্লাহর রাসূল সা. উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ছাড়া অন্য কোন জন্তু কোরবানি করেননি ও কোরবানি করতে বলেননি। তাই কোরবানি শুধু এগুলো দিয়েই করতে হবে। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে কোরবানির জন্য সর্বোত্তম জন্তু হল শিংওয়ালা সাদা-কালো দুম্বা। কারণ রাসূলে কারীম সা. এ ধরনের দুম্বা কোরবানি করেছেন

---

[1] সূরা হজ্ব : ৩৭
[2] সূরা হজ্ব : ৩৪
[3] মুসলিম- ১৯৬৩

বলে বোখারি ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে। উট ও গরু-মহিষে সাত ভাগে কোরবানি দেয়া যায়। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن جابر– رضى الله عنه– أنه قال : نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. (رواه ابن ماجه ٣١٣٢ صححه الألباني)

'আমরা হুদাইবিয়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা উট ও গরু দ্বারা সাত জনের পক্ষ থেকে কোরবানি দিয়েছি।'[1]

গুণগত দিক দিয়ে উত্তম হল কোরবানির পশু হৃষ্টপুষ্ট, অধিক গোশত সম্পন্ন, নিখুঁত, দেখতে সুন্দর হওয়া।

(২) শরিয়তের দৃষ্টিতে কোরবানির পশুর বয়সের দিকটা খেয়াল রাখা জরুরি। উট পাঁচ বছরের হতে হবে। গরু বা মহিষ দু বছরের হতে হবে। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা হতে হবে এক বছর বয়সের।

(৩) কোরবানির পশু যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। যেমন হাদিসে এসেছে :—

عن البراء بن عازب– رضى الله عنه– قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي،– وفي رواية: تجزىء – العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى. (رواه الترمذي ١٥٤٦ وفي رواية النسائي٤٣٧١) ذكر (العجفاء) بدل (الكسيرة) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي

সাহাবি আল-বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন তারপর বললেন : **চার ধরনের পশু, যা দিয়ে কোরবানি জায়েজ হবে না। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে পরিপূর্ণ হবে না—অন্ধ ; যার অন্ধত্ব স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত ; যার রোগ স্পষ্ট, পঙ্গু ; যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং আহত ; যার কোন অংগ ভেংগে গেছে।** নাসায়ির বর্ণনায় 'আহত' শব্দের স্থলে 'পাগল' উল্লেখ আছে।[2]

আবার পশুর এমন কতগুলো ত্রুটি আছে যা থাকলে কোরবানি আদায় হয় কিন্তু মাকরূহ হবে। এ সকল দোষত্রুটিযুক্ত পশু কোরবানি না করা ভাল। সে ত্রুটিগুলো হল শিং ভাংগা, কান কাটা, লেজ কাটা, ওলান কাটা, লিংগ কাটা ইত্যাদি।

---

[1] ইবনে মাজা- ৩১৩২, হাদিসটি সহিহ

[2] তিরমিজি-১৫৪৬, নাসায়ি- ৪৩৭১, হাদিসটি সহিহ

(৪) যে পশুটি কোরবানি করা হবে তার উপর কোরবানি দাতার পূর্ণ মালিকানা সত্ত্ব থাকতে হবে। বন্ধকি পশু, কর্জ করা পশু বা পথে পাওয়া পশু দ্বারা কোরবানি আদায় হবে না।

কোরবানির নিয়মাবলি

কোরবানির পশু কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করা

কোরবানির জন্য পশু পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য নিম্নোক্ত দুটো পদ্ধতির একটি নেয়া যেতে পারে।

(ক) মুখের উচ্চারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এভাবে বলা যায় যে 'এ পশুটি আমার কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করা হল।' তবে ভবিষ্যৎ বাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না। যেমন বলা হল—'আমি এ পশুটি কোরবানির জন্য রেখে দেব।'

(খ) কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় যেমন কোরবানির নিয়তে পশু ক্রয় করল অথবা কোরবানির নিয়তে জবেহ করল। যখন পশু কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করা হল তখন নিম্নোক্ত বিষয়াবলী কার্যকর হয়ে যাবে।

প্রথমত : এ পশু কোরবানি ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না, দান করা যাবে না, বিক্রি করা যাবে না। তবে কোরবানি ভালভাবে আদায় করার জন্য তার চেয়ে উত্তম পশু দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে।

দ্বিতীয়ত : যদি পশুর মালিক ইন্তেকাল করেন তাহলে তার ওয়ারিশদের দায়িত্ব হল এ কোরবানি বাস্তবায়ন করা।

তৃতীয়ত : এ পশুর থেকে কোন ধরনের উপকার ভোগ করা যাবে না। যেমন দুধ বিক্রি করতে পারবে না, কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারবে না, সওয়ারি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, পশম বিক্রি করা যাবে না। যদি পশম আলাদা করে তাবে তা সদকা করে দিতে হবে, বা নিজের কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে, বিক্রি করে নয়।

চতুর্থত : কোরবানি দাতার অবহেলা বা অযত্নের কারণে যদি পশুটি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে বা চুরি হয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায় তাহলে তার কর্তব্য হবে অনুরূপ বা তার চেয়ে ভাল একটি পশু ক্রয় করা।

আর যদি অবহেলা বা অযত্নের কারণে দোষযুক্ত না হয়ে অন্য কারণে হয়, তাহলে দোষযুক্ত পশু কোরবানি করলে চলবে।

যদি পশুটি হারিয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায় আর কোরবানি দাতার উপর পূর্ব থেকেই কোরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে সে কোরবানির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। আর যদি পূর্ব থেকে ওয়াজিব ছিল না কিন্তু সে কোরবানির নিয়তে পশু কিনে ফেলেছে তাহলে চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে অথবা হারিয়ে গেলে তাকে আবার পশু কিনে কোরবানি করতে হবে।

কোরবানির ওয়াক্ত বা সময়

কোরবানি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি এবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কোরবানি আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। অবশ্য কাজা হিসেবে আদায় করলে অন্য কথা।

যারা ঈদের সালাত আদায় করবেন তাদের জন্য কোরবানির সময় শুরু হবে ঈদের সালাত আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে কোরবানির পশু জবেহ করা হয় তাহলে কোরবানি আদায় হবে না। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن البراء بن عازب -رضى الله عنه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا، أن نصلى ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. (رواه البخاري٩٦٥)

আল-বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ স. খুতবাতে বলেছেন : **এ দিনটি আমরা শুরু করব সালাত দিয়ে। অত:পর সালাত থেকে ফিরে আমরা কোরবানি করব। যে এমন আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর যে এর পূর্বে জবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করল। কোরবানির কিছু আদায় হল না।**[1]

সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কোরবানি পশু জবেহ না করে সালাতের খুতবা দুটি শেষ হওয়ার পর জবেহ করা ভাল। কেননা রাসূলুল্লাহ স. এ রকম করেছেন। হাদিসে এসেছে—

[1] বোখারি- ৯৬৫

قال جندب بن سفيان البجلي -رضى الله عنه-: صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب ثم ذبح ... (رواه البخاري ٩٨٥)

সাহাবি জুনদাব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী রা. বলেছেন : নবী কারীম স. কোরবানির দিন সালাত আদায় করলেন অত:পর খুতবা দিলেন তারপর পশু জবেহ করলেন।[1]

عن جندب بن سفيان قال : شهدت النبي يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. (رواه البخاري ٥٥٦٢)

জুনদাব ইবনে সুফিয়ান বলেন, আমি কোরবানির দিন নবী কারীম সা.-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, **যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে জবেহ করেছে সে যেন আবার অন্য স্থানে জবেহ করে। আর যে জবেহ করেনি সে যেন জবেহ করে।**[2]

আর কোরবানির সময় শেষ হবে যিলহজ মাসের তেরো তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে। অতএব কোরবানির পশু জবেহ করার সময় হল চার দিন। যিলহজ মাসের দশ, এগারো, বার ও তেরো তারিখ। এটাই উলামায়ে কেরামের নিকট সর্বোত্তম মত হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ : এক. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِّ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. الحج : ٢٨

'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদের চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।'[3]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারি রহ. বলেন : ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: 'এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে বুঝায় কোরবানির দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন।'[4]

---

[1] বোখারি- ৯৮৫
[2] বোখারি- ৫৫৬২
[3] সূরা হজ্ব : ২৮
[4] ফাতহুল বারী, ২য় খন্ড, পৃ-৫৬১

অতএব এ দিনগুলো আল্লাহ তাআলা কোরবানির পশু জবেহ করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। দুই. রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :—

كل أيام التشريق ذبح. (رواه أحمد ٤/ ٨٢، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة)

'আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিন জবেহ করা যায়।'[1]

আইয়ামে তাশরীক বলতে কোরবানির পরবর্তী তিন দিনকে বুঝায়।

তিন. কোরবানির পরবর্তী তিন দিনে সওম পালন জায়েজ নয়। এ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে এ তিন দিনে কোরবানি করা যাবে।

চার. রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **'আইয়ামে তাশরীক হল খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর জিকির করার দিন।'**

এ দ্বারা বুঝে নিতে পারি যে, যে দিনগুলো আল্লাহ খাওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন সে দিনগুলোতে কোরবানির পশু জবেহ করা যেতে পারে।

পাঁচ. সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোরবানির পরবর্তী তিনদিন কোরবানির পশু জবেহ করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন : আলী ইবনে আবি তালেব রা. বলেছেন : 'কোরবানির দিন হল ঈদুল আজহার দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন।' অধিকাংশ ইমাম ও আলেমদের এটাই মত। যারা বলেন, কোরবানির দিন হল মোট তিন দিন; যিলহজ মাসের দশ, এগারো ও বার তারিখ। এবং বার তারিখের পর জবেহ করলে কোরবানি হবে না, তাদের কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই ও মুসলিমদের ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[2]

মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোরবানি

মূলত কোরবানির প্রচলন জীবিত ব্যক্তিদের জন্য। যেমন আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ স. ও তার সাহাবাগণ নিজেদের পক্ষে কোরবানি করেছেন। অনেকের ধারণা কোরবানি শুধু মৃত ব্যক্তিদের জন্য করা হবে। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তবে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কোরবানি করা জায়েজ ও একটি সওয়াবের কাজ। কোরবানি একটি সদকা। আর মৃত ব্যক্তির নামে যেমন সদকা করা যায় তেমনি তার নামে কোরবানিও দেয়া যায়।

যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য সদকার বিষয়ে হাদিসে এসেছে—

---

[1] আহমদ- ৪/৮২, হাদিসটি সহিহ

[2] যাদুল মাআদ, ২য় খন্ড, পৃ-৩১৯

عن عائشة– رضى الله عنها– أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصى، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم. (رواه البخاري ١٣٣٨،٢٧٦٠ ومسلم ١٠٠٤)

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—হে রাসূল ! আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। কোন অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয় তিনি কোন কথা বলতে পারলে অসিয়ত করে যেতেন। আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে সদকা করি তাতে কি তার সওয়াব হবে ? তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।[1]

মৃত ব্যক্তির জন্য এ ধরনের সদকা ও কল্যাণমূলক কাজের যেমন যথেষ্ট প্রয়োজন ও তেমনি তাঁর জন্য উপকারী।

এমনিভাবে একাধিক মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি কোরবানি করা জায়েজ আছে। অবশ্য যদি কোন কারণে মৃত ব্যক্তির জন্য কোরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য পূর্ণ একটি কোরবানি করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি নিজেকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য কোরবানি করেন। এটা মোটেই ঠিক নয়। ভাল কাজ নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হয় তারপর অন্যান্য জীবিত ও মৃত ব্যক্তির জন্য করা যেতে পারে। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عائشة وأبي هريرة –رضى الله عنهما– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، (مخصيين) فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح آخر عن محمد، وعن آل محمد– صلى الله عليه وسلم– . (صحيح ابن ماجة ٢٥٣١ (صححه الألباني)

আয়েশা রা. ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. যখন কোরবানি দিতে ইচ্ছা করলেন তখন দুটো দুম্বা ক্রয় করলেন। যা ছিল বড়, হৃষ্টপুষ্ট, শিংওয়ালা, সাদা-কালো বর্ণের এবং খাসি। একটি তিনি তার ঐ সকল উম্মতের

---

[1] বোখারি-১৩৩৮, মুসলিম-১০০৪

জন্য কোরবানি করলেন ; যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তার রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে, অন্যটি তার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য কোরবানি করেছেন।[1]

মৃত ব্যক্তি যদি তার সম্পদ থেকে কোরবানি করার অসিয়ত করে যান তবে তার জন্য কোরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

অংশীদারির ভিত্তিতে কোরবানি করা

যাকে 'ভাগে কোরবানি দেয়া' বলা হয়।

ভেড়া, দুম্বা, ছাগল দ্বারা এক ব্যক্তি একটা কোরবানি করতে পারবেন। আর উট, গরু, মহিষ দ্বারা সাত জনের নামে সাতটি কোরবানি করা যাবে। ইতিপূর্বে জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে।

অংশীদারি ভিত্তিতে কোরবানি করার দুটি পদ্ধতি হতে পারে :

(এক) সওয়াবের ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া। যেমন কয়েক জন মুসলিম মিলে একটি বকরি ক্রয় করল। অত:পর একজনকে ঐ বকরির মালিক বানিয়ে দিল। বকরির মালিক বকরিটি কোরবানি করল। যে কজন মিলে বকরি খরিদ করেছিল সকলে সওয়াবের অংশীদার হল।

(দুই) মালিকানার অংশীদারির ভিত্তিতে কোরবানি। দু জন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বকরি কিনে সকলেই মালিকানার অংশীদার হিসেবে কোরবানি করল। এ অবস্থায় কোরবানি শুদ্ধ হবে না। অবশ্য উট, গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি জায়েজ আছে।

মনে রাখতে হবে কোরবানি হল একটি এবাদত ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভের উপায়। তাই তা আদায় করতে হবে সময়, সংখ্যা ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে শরিয়ত অনুমোদিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে। কোরবানির উদ্দেশ্য শুধু গোশত খাওয়া নয়, শুধু মানুষের উপকার করা নয় বা শুধু সদকা (দান) নয়। কোরবানির উদ্দেশ্য হল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটি মহান নিদর্শন তার রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আদায় করা।

তাই, আমরা দেখলাম কীভাবে রাসূলুল্লাহ সা. গোশতের বকরি ও কোরবানির বকরির মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন যা সালাতের পূর্বে জবেহ হল তা বকরির গোশত আর যা সালাতের পরে জবেহ হল তা কোরবানির গোশত।

[1] ইবনে মাজা, হাদিসটি সহিহ

কোরবানি দাতা যে সকল কাজ থেকে দূরে থাকবেন

হাদিসে এসেছে—

عن أم سلمة– رضى الله عنها– أن النبي– صلى الله عليه وسلم– قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. (رواه مسلم ١٩٧٧) وفي رواية له: فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: حتى يضحي.

উম্মে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : **তোমাদের মাঝে যে কোরবানি করার ইচ্ছে করে সে যেন যিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।** ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তার অন্য একটি বর্ণনায় আছে—**'সে যেন চুল ও চামড়া থেকে কোন কিছু স্পর্শ না করে।** অন্য বর্ণনায় আছে **'কোরবানির পশু জবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে।'**[1]

কোরবানি দাতা চুল ও নখ না কাটার নির্দেশে কি হিকমত রয়েছে এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন : কোরবানি দাতা হজ করার জন্য যারা এহরাম অবস্থায় রয়েছেন তাদের আমলে যেন শরিক হতে পারেন, তাদের সাথে একাত্মতা বজায় রাখতে পারেন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন : 'কোরবানি দাতা চুল ও নখ বড় করে তা যেন পশু কোরবানি করার সাথে সাথে নিজের কিছু অংশ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোরবানি (ত্যাগ) করায় অভ্যস্ত হতে পারেন এজন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'[2] যদি কেউ যিলহজ মাসের প্রথম দিকে কোরবানি করার ইচ্ছা না করে বরং কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোরবানির নিয়ত করল সে কি করবে? সে নিয়ত করার পর থেকে কোরবানির পশু জবেহ পর্যন্ত চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে।

কোরবানির পশু জবেহ করার নিয়মাবলি

কোরবানি দাতা নিজের কোরবানির পশু নিজেই জবেহ করবেন, যদি তিনি ভালভাবে জবেহ করতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. নিজে জবেহ করেছেন। আর জবেহ করা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম। তাই প্রত্যেকের নিজের কোরবানি নিজে জবেহ করার চেষ্টা করা উচিত।

---

[1] মুসলিম-১৯৭৭

[2] আহকামুল উযহিয়্যাহ : ইবনে উসাইমীন। পৃ-৭৭

ইমাম বোখারি রহ. বলেছেন : 'সাহাবি আবু মুসা আশআরী রা. নিজের মেয়েদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন নিজ হাতে নিজেদের কোরবানির পশু জবেহ করেন।'[1] তার এ নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় মেয়েরা কোরবানির পশু জবেহ করতে পারেন। তবে কোরবানি পশু জবেহ করার দায়িত্ব অন্যকে অর্পণ করা জায়েজ আছে। কেননা সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সা. তেষট্টিটি কোরবানির পশু নিজ হাতে জবেহ করে বাকিগুলো জবেহ করার দায়িত্ব আলী রা.-কে অর্পণ করেছেন।[2]

জবেহ করার সময় যে সকল বিষয় লক্ষণীয়

(১) যা জবেহ করা হবে তার সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে, তাকে আরাম দিতে হবে। যাতে সে কষ্ট না পায় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। হাদিসে এসেছে—

عن شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته. (رواه مسلم ١٩٥٥)

সাহাবি শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. বলেছেন : **আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল বিষয়ে সকলের সাথে সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করবে আর যখন জবেহ করবে তখনও তা সুন্দরভাবে করবে। তোমাদের একজন যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যা জবেহ করা হবে তাকে যেন প্রশান্তি দেয়।**[3]

(২) যদি উট জবেহ করতে হয় তবে তা নহর করবে। নহর হল উটটি তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে আর সম্মুখের বাম পা বাধা থাকবে। তার বুকে ছুরি চালানো হবে। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন :—

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

'সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।'[4]

---

[1] ফাতহুল বারী ১০/২১

[2] মুসলিম- ১২১৮

[3] মুসলিম-১৯৫৫

[4] সূরা হজ : ৩৬

ইবনে আব্বাস রা. বলেন : এর অর্থ হল তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর সামনের বাম পা বাধা থাকবে।[1]

উট ছাড়া অন্য জন্তু হলে তা তার বাম কাতে শোয়াবে। ডান হাত দিয়ে ছুরি চালাবে। বাম হাতে জন্তুর মাথা ধরে রাখবে। মোস্তাহাব হল জবেহকারী তার পা জন্তুটির ঘারে রাখবে। যেমন ইতিপূর্বে আনাস রা. বর্ণিত বোখারির হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْه . (الأنعام : ١١٨)

'যার উপর আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) উচ্চারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর।'[2] জবেহ করার সময় তাকবীর বলা মোস্তাহাব। যেমন হাদিসে এসেছে:—

عن جابر رضي الله عنه ... وأتى بكبش ذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:

بِسْمَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُمَّ هَذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ. (رواه أبو داود وصححه الألباني)

জাবের রা. থেকে বর্ণিত ... একটি দুম্বা আনা হল। রাসূলুল্লাহ স. নিজ হাতে জবেহ করলেন এবং বললেন **'বিসমিল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবর, হে আল্লাহ ! এটা আমার পক্ষ থেকে। এবং আমার উম্মতের মাঝে যারা কোরবানি করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে।'**[3] অন্য হাদিসে এসেছে—

ضحى رسول الله– صلى الله عليه وسلم– بكبشين أملحين أقرنين، ويسمى ويكبر. (سنن الدارمي ١٩٨٨ وسنده صحيح.)

রাসূলুল্লাহ সা. দুটি শিংওয়ালা ভেড়া জবেহ করলেন, তখন বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বললেন।[4] জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর পাঠের পর—اللّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ—(হে আল্লাহ এটা তোমার তরফ থেকে, তোমারই জন্য) বলা যেতে পারে। যার পক্ষ থেকে কোরবানি করা হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করে

---

[1] তাফসীর ইবনে কাসির

[2] সূরা আনআম : ১১৮

[3] আবু দাউদ

[4] সুনানে দারামী- ১৯৮৮, হাদিসটি সহিহ

দোয়া করা জায়েজ আছে। এ ভাবে বলা—'হে আল্লাহ তুমি অমুকের পক্ষ থেকে কবুল করে নাও।' যেমন হাদিসে এসেছে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. কোরবানির দুম্বা জবেহ করার সময় বললেন :—

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ . (رواه مسلم ١٩٦٧)

'আল্লাহ নামে, হে আল্লাহ ! আপনি মোহাম্মদ ও তার পরিবার-পরিজন এবং তার উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।'[1]

কোরবানির গোশত কারা খেতে পারবেন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. (الحج :٢٨)

'অত:পর তোমরা উহা হতে আহার কর এবং দু:স্থ, অভাবগ্রস্থকে আহার করাও।'[2] রাসূলুল্লাহ স. কোরবানির গোশত সম্পর্কে বলেছেন :—

كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري ٥٥٦٩ من حديث سلمة ابن الأكوع.

'তোমরা নিজেরা খাও ও অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ কর।'[3]

'আহার করাও' বাক্য দ্বারা অভাবগ্রস্থকে দান করা ও ধনীদের উপহার হিসেবে দেয়াকে বুঝায়। কতটুকু নিজেরা খাবে, কতটুকু দান করবে আর কতটুকু উপহার হিসেবে প্রদান করবে এর পরিমাণ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত ও হাদিসে কিছু বলা হয়নি। তাই উলামায়ে কেরাম বলেছেন : কোরবানির গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজেরা খাওয়া, এক ভাগ দরিদ্রদের দান করা ও এক ভাগ উপহার হিসেবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের দান করা মোস্তাহাব।

কোরবানির গোশত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। 'কোরবানির গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না'—বলে যে হাদিস রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তাই যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

তবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ বিষয়ে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : সংরক্ষণ নিষেধ হওয়ার কারণ হল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময় তিন দিনের

---

[1] মুসলিম- ১৯৬৭

[2] সূরা হজ্ব-২৮

[3] বোখারি-৫৫৬৯

বেশি কোরবানির গোশত সংরক্ষণ করা জায়েজ হবে না। তখন 'সংরক্ষণ নিষেধ' সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যদি দুর্ভিক্ষ না থাকে তবে যতদিন ইচ্ছা কোরবানি দাতা কোরবানির গোশত সংরক্ষণ করে খেতে পারেন। তখন 'সংরক্ষণ নিষেধ রহিত হওয়া' সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করা হবে।

কোরবানির পশুর গোশত, চামড়া, চর্বি বা অন্য কোন কিছু বিক্রি করা জায়েজ নয়। কসাই বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে কোরবানির গোশত দেয়া জায়েজ নয়। হাদিসে এসেছে :—

ولا يعطى في جزارتها شيئا (رواه البخاري ١٧١٦ ومسلم ١٣١٧)

'তার প্রস্তুত করণে তার থেকে কিছু দেয়া হবে না।'[1]

তবে দান বা উপহার হিসেবে কসাইকে কিছু দিলে তা না-জায়েজ হবে না।

সমাপ্ত

[1] বোখারি -১৭১৬ মুসলিম-১৩১৭